শ্রীঅরবিন্দ

ভারতের নবজন্ম

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

প্রকাশক :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

পণ্ডিচেরী

অনুবাদক :

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

তৃতীয় সংস্করণ

মে, ১৯৫৪

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস

পণ্ডিচেরী

937/53/1500

ভারতের নবজন্ম

১

ভারতের নবজন্ম হইতেছে—এই ধরণের কথা আজকাল আমাদের মধ্যে খুবই শুনা যায়। ফলতঃ, দেশে যে একটা নূতন জীবনের, নূতন চিন্তার বহুভঙ্গিম ধারা ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতেছে, ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় ভারতের সত্য সত্যই নবজন্ম হইতেছে। যদি তাই হয়, যদি বাস্তবিকই ভারত একটা নূতন জন্ম গ্রহণ করিতে চলিয়া থাকে, তবে ব্যাপারটি কেবল তাহার নিজের পক্ষে নয়, জগতের পক্ষেও যে কত বড় অমূল্য জিনিষ হইয়া পড়ে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নিজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, এই নবজন্মের অর্থ, ভারতের যে চিরন্তন ধর্ম্ম, যে সমষ্টিগত শিক্ষা-দীক্ষা তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পরিবর্ত্তন—এবং এ কথা বলিতে মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ যাহা কিছু বুঝায় তাহা সবই সেই নবজন্মের অন্তর্ভূত। আর জগতের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখি, একটা অভিনব শক্তির অভ্যুত্থান, আর সেই শক্তির সম্মুখে কত অভিনব সম্ভাবনা। মনের যে ভঙ্গী, অন্তরাত্মার যে ভাব আধুনিক মানুষের চিন্তাধারাকে এতদিন অবধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে কত পৃথক্ ঐ উদীয়মান শক্তির ছন্দ—ইহার অনুরূপ

কিছু পাইতে হইলে আমাদিগকে যাইতে হইবে ভবিষ্যতে, ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত কবিবে যে ভাব, যে ভঙ্গী একমাত্র তাহারই সহিত ইহাব তুলনা হইতে পাবে। সে যাহা হউক, ভারতেব পক্ষে ভাবতের নবজন্ম যে কি বস্তু শুধু সেই কথাটাই আপাততঃ আমি আলোচনা কবিতে চাই। কারণ, ভাবতের নবজীবন সমস্ত মানবজাতিকে লইয়া কি করিবে বা না কবিবে, এই বড় সমস্যার আগে হইতেছে, ভারত নিজে তাহাব নিজের জীবন লইযা কি করিবে, এই ছোট সমস্যাটি। বিশেষতঃ অনতি-বিলম্বে এই সমস্যাটি পূবণ করাই আমাদের পক্ষে বোধ হয একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে।

সকলেব আগে গোড়ার প্রশ্ন হইতেছে, বাস্তবিকই ভাবতেব একটা নবজন্ম আসিয়াছে কি না। প্রশ্নটিব উত্তব নির্ভর করিবে 'নবজন্ম' বলিতে কি বুঝি আমরা তাহার উপরে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে কি ঘটে বা না ঘটে তাহার উপরেও অনেক নির্ভর কবিবে—কাবণ, জিনিষটি বর্ত্তমানে রহিয়াছে অতি অপূর্ণ অবস্থায়। পরে তাহা কি রূপ লইবে বা না লইবে তাহা এখন পর্য্যন্ত কিছু জোব করিযা বলা যায না। 'নবজন্ম' কথাটা ইউরোপীয় বেনাসেন্স (Renaissance) কথাটির প্রতিধ্বনি—নবজন্ম বলিতেই ইউবোপ তাহার শিক্ষাদীক্ষার যে সন্ধিমুহূর্ত্তকে প্রথম এই নাম দিয়াছিল, তাহারই চিত্র আমাদের মনে পড়িয়া যায। কিন্তু ইউরোপের এই নবজন্মকে ঠিক নবজাগরণ বলা যায় না, তাহা একটা আমূল পরিবর্ত্তন, একটা বিপর্য্যয়।

ভারতের নবজন্ম

ইউবোপ আগে ছিল খৃষ্টীয়-ধর্ম্মেব, টিউটন-জাতিব, ফিউডল-তন্ত্রের হাবে ভাবে অভিভূত; তাহাব উপর আসিয়া পড়িল প্রাচীন গ্রীস ও বোমেব শিক্ষাদীক্ষার বন্যা, তাহাতে পুরাতন ধাবা ধুইয়া মুছিয়া গেল; সেখানে স্থাপিত হইল নূতন ভাব নূতন ৰূপ, আব তাহাব আনুষঙ্গিক বিপুল জটিল অভিনব বিধি-ব্যবস্থা সব। এই ধরণেব নবজন্ম ভাবতে কখনও সম্ভব নয়। ভারতের নবজন্মেব তুলনা ইউবোপে কতক পাওয়া যাইতে পাবে আধুনিক আয়র্লণ্ডেব নবীন সাধনায়। আযর্লণ্ডেব যে জাতীয় জাগরণ আজ দেখা দিয়াছে, তাহা চাহিতেছে আপনাকে প্রকাশ করিয়া ধরিবাব নূতন একটা অনুপ্রেরণা,—এমন একটা অনুপ্রেবণা যাহা তাহাকে লইযা চলিবে অন্তবাত্মার দিকে এবং এই অন্তবাত্মাব শক্তিতেই সে নূতন কবিযা গড়িবে স্বজিবে বৃহৎ ভাবে। আযর্লণ্ড এই অনুপ্রেবণা পাইযাছে আবাব তাহাব প্রাচীন কেল্টিক্ শিক্ষাদীক্ষাব মধ্যে ফিরিযা গিযা—তাহার যে শিক্ষাদীক্ষা ইংবাজী শিক্ষাদীক্ষার তলে এতদিন চাপা পড়িযাছিল। ভাবতবর্ষেও এই বকমেরই একটা পুনবভ্যুত্থান ঘটিতেছে। ১৯০৫ সালের রাষ্ট্রনীতিক আন্দোলনে এই জিনিষটিই বিশেষভাবে মুখ লইযা উঠিয়াছে। তবুও আযর্লণ্ডেব সহিত তুলনা কবিলেও ভারত যে সত্য লইয়া জাগিতেছে, তাহার সবখানি হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

তারপর আব একটি জিনিষ আমাদিগকে দেখিতে হইবে। ভাবতে যে নবজীবনের চাঞ্চল্য দেখা দিযাছে, তাহা এখনও

ভারতের নবজন্ম

একটা বিপুল অথচ অস্পষ্ট কুয়াসার মত—তাহার মধ্যে খেলিতেছে নানা বিরোধী ধাবা ; শুধু এখানে ওখানে দুই একটা কেন্দ্রে স্পষ্টতর, স্ফুটতর রূপায়ণের চেষ্টা চলিয়াছে, এই দুই একটা স্থানেই নূতন চেতনা নিজের সম্বন্ধে সজাগ হইয়া বাহিরে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই সব নব রূপায়ণ সাধারণের মনের মধ্যে যে সম্যক প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, তাহা এখনও বলা চলে না। এগুলি ভবিষ্যতের প্রথম পরিকল্পনা,—বৈতালিকের কণ্ঠে আবাহন, অগ্রণীর হাতে মশাল। মোটের উপর আমবা দেখিতেছি, বিবাট কি এক শক্তি নূতন জগতে, ভিন্নপ্রকার ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু ছোট বড় অসংখ্য বন্ধনে তাহার প্রতি অঙ্গ এখনও আবদ্ধ—এই সব বন্ধন কতক সে অতীতে নিজেই নিজের চারিদিকে আঁটিয়া দিয়াছে, কতক বা ইদানীন্তন কালে বাহির হইতে তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে। এই সকল কাটিয়া ছিঁড়িয়া সে চাহিতেছে মুক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে, স্বকীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ধরিতে, চতুর্দ্দিকে নিজের প্রতিভা ছড়াইয়া দিতে, জগতের উপর আপনাব নাম আঁকিয়া দিতে। বাঁধন যে ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে তাহার শব্দ সকল দিকেই আমবা শুনিতেছি, এখানে ওখানে একেবারে হঠাৎ ছিঁড়িয়া পড়িবার ধ্বনিও শ্রবণে আসিতেছে। তবুও মুক্তগতির স্বাচ্ছন্দ্য এখনও আসে নাই। চোখে দৃষ্টি এখনও আবছায়া, অন্তরাত্মার কোরক এখনও অর্দ্ধবিকশিত, মহাশক্তি এখনও উঠিয়া দাঁড়ান নাই।

ভারতের নবজন্ম

নবজন্ম বা জাগরণ কথাটা ভারতের পক্ষে আদৌ প্রযোজ্য কি না, তাহা আর একটু বিচাব কবিযা দেখা দরকার। কারণ, অনেকে বলিতে পাবেন যে ভাবত চিবদিনই জাগ্রত, নূতন কবিয় সে আবার জাগিবে কি? কথাটার মধ্যে যে কিছু সত্য নাই, এমন নয়। বিশেষতঃ, ভারতের পূজাবী বিদেশী যাঁহারা বাহিব হইতে এখানে আসেন, তাঁহাদের মনে কোন পুরাতন সংস্কারেব আবর্জনা না থাকায়, প্রথমেই যে জিনিষটি তাঁহাদের চোখে লাগে, তাহা হইতেছে অতীতেব ও বর্ত্তমান ভারতের মধ্যে একটা সজীব সংযোগ-ধাবা। এ জিনিষটি এত স্পষ্ট যে, অন্য সব জিনিষ হঠাৎ নজবে না-ও পডিতে পারে। কিন্তু আমবা যাহাবা দেশের সন্তান, আমবা ত ঠিক সে ভাবে দেখিতে পারি না। ভাবতে যে বিপুল অধঃপতন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে একেবাবে চবমে পৌছিয়াছিল, তাহার বিষময় ফল হইতে আমরা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইতেছি না। এ কথা কখনও অস্বীকাব কবিবাব নয যে, ভাবতের সত্যসত্যই এমন একটা সঙ্কটেব কাল আসিয়াছিল—তাহা যদিও খুব বেশী দিন স্থাযী হয় নাই, কিন্তু সেই অল্প সময়েব মধ্যেই কি দারুণ ক্ষতি করিয়া দিয়াছে!—যখন জীবনের সে দীপ্ত বহ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায় হইযা গিয়াছিল, এমন কি, একটা মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল, যখন বোধ হইতে-ছিল এই বুঝি ভারতের শেষ, এইখানেই বুঝি ভারতের ইতি। তখনই তাহাব বাষ্ট্রে দেখা দিয়াছিল সেই বিশৃঙ্খলতা, অবাজকতা, যাহার কল্যাণে ইউরোপের যত ভাগ্য-অন্বেষী এখানে আস্তানা

খুঁজিয়া পাইল। তখনই অন্তরে তাহার আসিয়া পড়িতে লাগিল ঘোর তামসিকতা, যাহার কবলে কবলিত অস্তমিত হইয়া চলিল ধর্ম্মে, শিল্পকলায়, তাহার সকল সৃজন-প্রতিভা। দর্শন, বিজ্ঞান, বুদ্ধির সৃষ্টি বহু পূর্ব্বেই লোপ পাইয়াছিল—যাহা কিছু বা ছিল, তাহা বাক্‌সর্ব্বস্ব পাণ্ডিত্যের জড় স্থাবরত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অধঃপতনের চরম সীমার লক্ষণ সব সর্ব্বত্র তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহাকেই ভারত বুঝি নাম দিয়াছে সেই যুগসন্ধি বা প্রলয়—সেখানে একটা সৃষ্টির শেষ, যাহার পরে আবার নূতন সৃষ্টির আরম্ভ। এই যে কালধর্ম্ম এবং ইহার সাথে সাথে যে আসিয়া পড়িল বাহির হইতে আগত ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার চাপ, তাহাই ডাকিয়া আনিল ভারতের নব অভ্যুত্থান।

এই অভ্যুত্থান বুঝিতে হইলে তবে মোটামুটি তিনটি ধাপের উপর আমাদের নজর দিতে হইবে। প্রথম হইতেছে, অতীতে ভারতের সেই সমুন্নত শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনের মাধ্যন্দিন যুগ, আর তার পরে আসিয়া পড়িল যে জড়তা ও তামসিকতার সন্ধ্যা। দ্বিতীয় হইতেছে, পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের প্রথম সংস্পর্শ,—যখন ভারত মরিয়া পচিয়া গলিয়া প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল। তৃতীয় হইতেছে, কিছুদিন হইতে একটা স্পষ্ট মূর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে যে নবজীবনের স্পন্দন, যে ঊর্দ্ধমুখী গতি। একটি কথা এখানে স্মরণে রাখিতে হইবে এবং অনেকেই ন্যায্যতঃ এ কথাটির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। তাহা এই যে, ভারত চিরদিনই—এমন কি জাতীয় জীবনের ঘোর

অবসাদেব মধ্যেও, অক্ষত রাখিযাছে তাহাব অধ্যাত্ম প্রতিভা। এই বস্তুটিই ভারতকে রক্ষা কবিয়াছে ভারতেব প্রত্যেক সন্ধি-মুহূর্ত্তে—আব আজকাব যে নবজন্ম দেখা দিয়াছে, তাহারও গোড়ার অনুপ্রেবণা ঐ বস্তুটিরই মধ্যে। ভাবতকে যে চাপের ভার সহ্য করিতে হইযাছে, অন্য কোন জাতি তাহাতে বহু পূর্বেই দেহ-প্রাণ সমেত লুপ্ত হইয়া যাইত। এ কথা সত্য। কিন্তু তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাবত প্রাণে বাঁচিযা থাকিলেও, দেহে তাহাব ঘুণ ধবিযা আসিতেছিল ; জড়ত্বের আক্রমণে এক সময়ে মনে হইযাছিল তাহার আত্ম-শোধনেব সব শক্তি বুঝি পবাহত হইয়া যায়,—জডত্বই ত মৃত্যু! আবাব যখন এই মুক্তিব, নবজীবনের দিন আসিযাছে তখন ভাবতকে তাহাব নিজস্ব প্রকৃতি, তাহার অন্ত-রাত্মার ধর্ম্মটি ধবিযা বহিতেই হইবে। কিন্তু তাহার যে আকৃতি, যে দেহায়তন, সেখানে অনেক কিছুই পরিবর্ত্তন ঘটিবে এমন সম্ভাবনা আছে। ভাবতেব সেই একই অন্তরাত্মা পুনর্জ্জীবিত হইযা নূতন একটা আধাব গড়িযা লইবে, তাহারই প্রেবণায় নূতন রূপ সব ফুটিযা উঠিবে দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে; শিক্ষায়, রাষ্ট্রে, সমাজে—ভাবতের নবজন্মের ধবণ এই বকমেই হইবে বলিযা মনে হয। এই সব নূতন রূপ, অতীত ভারত যে সব সত্য প্রকাশিত করিযাছে, তাহাব বিবোধী হইবে না। কিন্তু প্রাচীন সত্যগুলিকে বিশুদ্ধ করিযা পূণতর কবিয়া নূতন ভঙ্গীতে আবাব প্রকাশিত কবিবে।

ভারতের এই যে পুরাণী প্রকৃতি, এই যে তাহার আপনকাব অন্তরাত্মা, সেটি কি? সাধারণভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে,

ভারতের নবজন্ম

ভারতবাসীব চিন্তার ধরণে স্বভাবতঃই আছে কেমন তত্ত্বের দিকে, দার্শনিকতার দিকে ঝোঁক; প্রবল একটা ধর্ম্মপ্রাণতা, বৈরাগ্যময় ভাবুকতা তাহার যেন মজ্জাগত; তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই আবদ্ধ যেন একটা পারলৌকিক আদর্শে, এই জিনিষটিই ইউবোপীযদের চোখে পড়িয়াছে এবং তাঁহারা এমনভাবে লিখিয়া ও বলিয়া থাকেন যেন ভারতেব সমস্ত স্বভাব বা প্রকৃতি বা অন্তবাত্মা ইহারই মধ্যে। তাহাদের মতে ভাবত কি? না, অসীমতার অনুভবে অভিভূত একটা তাত্ত্বিক, দার্শনিক, ধার্ম্মিক মন—জীবনের অনুপযোগী, স্বপ্নবিলাসী, কর্ম্মপঙ্গু—কর্ম্মকে জীবনকে 'মায়া' নাম দিয়া মুখ ফিবাইয়া অন্যদিকে সে চলিয়াছে। ভাবতবাসীও কিছুকাল ধরিয়া অন্যান্য বিষয়ের মত এই বিষয়েও তাহার ইউরোপীয় শিক্ষকের ও গুরুব বাক্যে নির্ব্বিচারে সায় দিয়া আসিয়াছে। তাহাব দর্শনের, তাহাব সাহিত্যের, তাহার ধর্ম্মের কথা সে বুক ফুলাইযা কহিতে শিখিয়াছে; কিন্তু আব সব বিষয়ে শুধু শিক্ষার্থী, অনুচিকীর্ষু হইতে পাবিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিযাছে। তার পরে ইউরোপই আবার একদিন আবিষ্কার করিল যে, সৌন্দর্য্যে, শক্তিতে, অপরূপ একটা শিল্পকলাও ভারতের ছিল। কিন্তু এই পর্য্যন্ত। এতদ্ব্যতীত ভাবতের আরও যে কিছু আছে বা থাকিতে পারে, তাহা ইউরোপেব জ্ঞান-গোচরে আদৌ আসিয়াছে কি না সন্দেহ। সুখের বিষয়, ইতি-মধ্যে ভারত পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকাব অভ্যাস ছাড়িতে আবম্ভ কবিয়া দিয়াছে, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইতে নিজের চোখ

দিয়া নিজের অতীতকে সে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে অনতিবিলম্বেই তাহার বোধগম্য হইয়াছে যে, এতদিন সে যে ভাবে দেখিয়াছে অর্থাৎ যে ভাবে তাহাকে দেখান হইয়াছে, সেটি সম্পূর্ণ ভুল পথ। বাস্তবিক, জিনিষকে একান্ত এক দিক দিয়া দেখিলে ভুল হইতে বাধ্য, আর সে ভুল পরিশেষে ধরা পড়েই। জর্ম্মণী সম্বন্ধেও কি এক সময়ে, মনে হয়, এই রকমের একটা ভুল ধারণা সর্ব্বসাধারণের ছিল না? দর্শনে ও সঙ্গীতে জর্ম্মণী খুব বড় বটে, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে সে পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, কর্ম্মজগতের স্থূল উপকরণবাজির পূর্ণ ব্যবহার সে জানে না—সুতরাং সে হইতেছে স্বপ্ন-বিলাসীর, ভাবুকের, পণ্ডিতের জাত—সে জিজ্ঞাসু, অধ্যবসায়ী, কর্ম্মঠ সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজনীতিক দক্ষতা হিসাবে পঙ্গু—একদিকে কি মহান্, আর একদিকে আবার কি তুচ্ছ, এই জর্ম্মণী—admirable ridiculous Germany. কি নিদারুণ আঘাতে ইউরোপের এই যে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা আমরা জানি। ভারতের নবজীবন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভারত-প্রতিভার সত্যকার প্রকৃতি ও সামর্থ্য দেখিয়াও ইউরোপের ভুল ভাঙ্গিবে—সেই একই রকম দারুণ আঘাতের ফলে নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু তবুও যথেষ্ট মাত্রায় আশ্চর্য্য হইয়া যাইবার মত জিনিষ সেখানে মিলিবে।

এ কথায় কোন সন্দেহই নাই যে, ভারতীয় চিত্তের আসল কলকাঠি হইতেছে আধ্যাত্মিকতা। অসীমের অনুভব তাহার জন্মগত। ভারত গোড়া হইতেই দেখিয়া বুঝিয়া আসিয়াছে—

এমন কি, তর্কবুদ্ধির শুষ্ক বাদ-বিচারের যুগে, ক্রম-ঘনায়মান অজ্ঞানের যুগেও এই সূক্ষ্মবোধ তাহার লোপ পায় নাই—যে জীব-নেব যত বাহ্যিক রূপায়ণ, কেবলমাত্র তাহারই আলোকে জীবনকে যথাযথ ধরা যায় না, কেবলমাত্র তাহাবই শক্তিতে জীবন যথাযথ যাপন হয না। স্থূলেব নিযম, স্থূলের শক্তিব মহত্ব সম্বন্ধে সে খুবই সজাগ ছিল; জড়-বিজ্ঞানের যে কি প্রয়োজন তাহা তাহার দৃষ্টিকে কখনও এড়াইয়া যাইতে পাবে নাই; দৈনন্দিন জীবনেব জন্য যে সব শিল্পকলা দবকাব তাহাতেও সে অকুশলী ছিল না। কিন্তু সে জানিত যে, স্থূল যতক্ষণ স্থূলেব অতীত যাহা, তাহাব সহিত সত্য সম্বন্ধে সম্মিলিত না হয়, ততক্ষণ স্থূল আপনাব পূর্ণ ব্যঞ্জনা পায না; সৃষ্টিব যে জটিল বৈচিত্র্য তাহা পরিচিত মানুষী-সংজ্ঞাব সহাযে ব্যাখ্যাত হয না, তাহা মানুষেব স্থূল দৃষ্টিব গোচরীভূত নহে; স্থূলেব পিছনে, মানুষেব নিজেবই ভিতবে আছে এমন আবও সব শক্তি, নৈমিত্তিক জীবনের সাধাবণ জ্ঞানে, যাহা তাহার কাছে ধবা দেয না; মানুষ নিজেব সত্তাব খুব সামান্য অংশেরই সম্বন্ধে সচেতন; দৃষ্টকে ঘিরিয়া রহিয়াছে অ-দৃষ্ট, ইন্দ্রিয়কে ঘিরিয়া বহিয়াছে অতীন্দ্রিয়—সসীমকে চিরদিনই ঘিরিয়া রহিয়াছে অসীম। ভারত আরও জানিত যে, আপনাকে ছাড়াইয়া উঠিবার শক্তি মানুষেব আছে, বর্ত্তমানে সে যাহা, তাহা অপেক্ষা নিজেরই পূর্ণতব গভীরতর সত্তা একটা লাভ কবিতে সে পারে। ইউরোপ আজকাল মাত্র এই সব সত্য দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে; তবু এখনও এ সকল বস্তু তাহাব পক্ষে এত

বৃহৎ যে, তাহাব সাধারণ বুদ্ধির কাছে সহজ হইযা উঠে নাই। কিন্তু ভারতেব দৃষ্টিব সম্মুখে পূর্ণ ব্যক্ত ছিল মানুষকে ছাড়াইযা রহিযাছে যে সব অগণিত দেবতা, দেবতাকে ছাডাইয়া রহিয়াছে যে ঈশ্বব, ঈশ্ববকে ছাড়াইযা বহিযাছে যে মানুষের নিজেবই অনির্ব্বচনীয অনন্ত সত্তা। ভাবত দেখিযাছে, এই জীবনকে অতিক্রম কবিযা উঠিয়া চলিয়াছে আবও সব জীবনের পরিক্রম, বর্ত্তমান মানসকে অতিক্রম কবিযা উঠিযা চলিযাছে আরও সব মানসেব পবিক্রম, সকলেব উপবে উদ্ভাসিত আত্মাব মহিমা। এই দৃষ্টি তাব ছিল বলিযাই ভাবত পাইযাছে একটা প্রশান্ত দুঃসাহস— সে দৃষ্টিতে নাই কোন সঙ্কোচ, নাই কোন ক্ষুদ্রতা। ইহাবই কল্যাণে যে কাজে প্রয়োজন অন্তবাত্মাব বল, বুদ্ধির বল, মনেব বল, প্রাণেব বল, তেমন কাজে কখনও সে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ভাবত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কবিযাছে যে, এমন কোন বস্তু নাই, যাহা মানুষে অধিকাব কবিতে পারে না—প্রযোজন শুধু ইচ্ছা-শক্তিকে, জ্ঞানশক্তিকে শাণিত সমর্থ কবিযা তোলা। অন্তবেব মধ্যে বহিয়াছে যে লোকপরম্পবা তাহা মানুষ জয করিতে পাবে, মানুষ হইতে পারে স্বরূপস্থ পুরুষ; মানুষ দেবতা হইতে পাবে, ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইতে পারে, এমন কি, হইযা যাইতে পাবে অনির্ব্বচনীয ব্রহ্ম। কিন্তু কেবল সিদ্ধান্তে পৌঁছিযাই ভাবত সন্তুষ্ট হয নাই, সিদ্ধান্তেব সহিত সাধনার পথও সে বাহির কবিযাছে। যুক্তিসিদ্ধ যাহা, তাহার অব্যর্থ প্রযোগ কি করিয়া হইতে পারে, যাহা অন্তবে বোধ মাত্র, তাহাকে জাগ্রতে শৃঙ্খলার

সহিত প্রকট, স্থিরপ্রতিষ্ঠ করা যায় কি রকমে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বস্তুমুখী কর্ম্মকৌশল, এই ব্যবহারবুদ্ধিও ভাবতের দার্শনিক-তার ধাতুগত বিশেষত্ব। যুগের পর যুগ ভাবত এই বকমে যে তাহাব দিব্যদৃষ্টিকে ধরিয়া চলিযাছে, উহাকে বাস্তবে পরিণত করিতে প্রয়াস কবিযা আসিযাছে, এই অভ্যাসেব ফলে তাহার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে অব্যর্থ অঙ্গরূপে দেখা দিযাছে, সূক্ষ্মের দিকে একটা প্রবল ঝোঁক, অসীমকে ধরিবার, অধিকাব কবিবার একটা দুর্দ্দমনীয আকাঙক্ষা—ইহা হইতেই আসিযাছে ভারতের সে সদা-জাগ্রত পাবত্রিকবুদ্ধি, তাহাব ঊর্দ্ধমুখী ভাবুকতা, তাহাব 'যোগ'-বিদ্যা, তাহাব দর্শনেব, শিল্পকলাব নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু ভারতেব অন্তরাত্মাব ইহাই সবখানি ছিল না, থাকিবার কথাও নয়। পার্থিব লোকে যে আধ্যাত্মিকতাব প্রকাশ, তাহা শূন্যেব উপব জন্মাইতে পারে না। আমাদেব পর্ব্বতবাজির শিখর সব স্বপ্নের ভোজবাজীব মত কি মেঘের জঠর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, মাটিব উপব কি তাহাদের প্রতিষ্ঠা নাই? ভারতের অতীতের দিকে তাকাইযা দেখ। আধ্যাত্মিকতার অব্যবহিত পরেই যে জিনিষটা চোখে পড়ে তাহা হইতেছে একটা বিরাট প্রাণশক্তি—জীবনের অফুরন্ত সামর্থ্যের, আনন্দের খেলা, সৃজনকর্ম্মে একটা অসম্ভব বকম প্রাচুর্য্য। ন্যূনপক্ষে তিন হাজার বৎসব, বাস্তবিক কিন্তু আবও অনেক বেশী কাল ধরিয়া ভারত-প্রতিভা অজস্র অনর্গলভাবে দুই হাতে ফেলিয়া ছড়াইয়া নিত্যই নূতন নূতন পথে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে কত

রকমারী রাষ্ট্র—গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, রাজচক্রবর্ত্তী-তন্ত্র—কত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য—কত মন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ, ইষ্টা-পূর্ত্ত—ধর্ম্মসম্প্রদায়, সাধনামার্গ, শাস্ত্র, অনুষ্ঠান, বিধান, রাজনীতি, সমাজনীতি—ব্যবসা, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ঐহিক পারত্রিক সকল রকম বিদ্যা—নাম করিয়া তাহার আর শেষ করা যায় না। আর ইহাদেব প্রত্যেকটিতে সে যে কি পরিমাণ কর্ম্মঠতা দেখাই-য়াছে, তাহাব লেখাজোখা নাই। সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে ত সে সৃষ্টি কবিয়াই চলিয়াছে,—তৃপ্তি নাই, শ্রান্তি নাই। শেষ যেন সে কিছুতেই হইতে দিবে না—বিশ্রাম লইবার, হাঁপ ছাড়ি-বাব, কিছুকালেব জন্য শক্তি সংগ্রহের জন্য চুপ করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকিবাব প্রয়োজন যেন মোটেও সে অনুভব কবে না। নিজের বাহিরেও সে আপনাকে ছড়াইয়া দিল। ভারতের নৌ-বহর সমুদ্র পার হইয়া চলিল। তাহার কাণায় কাণায় ভরা ঐশ্বর্য্যসম্পদ উপচিয়া গিয়া পড়িতে লাগিল জুড়িয়ায়, মিশব-দেশে, বোমবাজ্যে। সাগবের দ্বীপপুঞ্জ সব তাহার উপনিবেশ বক্ষে ধারণ করিল, দিকে দিকে ছড়াইয়া দিল তাহার শিল্প, তাহার কাব্য, তাহাব ধর্ম্মমত। ভারতের পদচিহ্ন পাওয়া যায় মেসোপোটেমিয়ার বালুরাশির অন্তরে। তাহারই ধর্ম্ম গিয়া জয় করিল চীন, জাপান আর পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া চলিল পালেস্তিন, আলেকসন্দ্রিয়া অবধি। উপনিষদের রূপকাবলী, বৌদ্ধদিগের মহাকাব্য প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল খৃষ্টের কণ্ঠে। ভারতের মাটিতে যেমন, তেমনি ভারতের কর্ম্মেও সর্ব্বত্রই আমরা

দেখিতে পাই এই অপরিমেয জীবনশক্তিব উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্য। ইউরোপের পণ্ডিতেরাই ত অনুযোগ করিয়া থাকেন যে ভারতের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, শিল্পে, অভাব পরিমাণেব—ঐশ্বর্য্যকে রাখিয়া ঢাকিয়া দেখাইবার কোন ইচছাই নাই সেখানে ; শূন্য বা ফাঁক কোথাও নাই, প্রত্যেক ছিদ্রটি সে মণিমুক্তা দিযা ভবিয়া দিযাছে, প্রত্যেক অবকাশে ফুটাইযা ধরিয়াছে অলঙ্কাবের আতিশয্য। এই স্বভাব তাহাব দোষেব হউক কি গুণের হউক, সে বিচার আমরা কবিতেছি না। আমরা বলিতেছি, ভাবতেব ছিল, জীবনীশক্তিব প্রাচুর্য্য, অন্তবে অনন্তের ভবাট আবেগ আর তাহারই অব্যর্থ পরিণাম হইতেছে ঐ স্বভাব। ভারত দুই হাতে তাহার ঐশ্বর্য্য বিতরণ কবিযা দিযাছে, কাবণ, না কবিযা তাহার উপায় ছিল না। নিখিল অনন্ত আপন আয়তনের এতটুকু ফাঁক পর্য্যন্ত জীবনীশক্তিতে, প্রাণেব স্পন্দনে পবিপূর্ণ করিয়া ধরিয়াছে—কেন ? কাবণ, অনন্ত যে অনন্ত !

কিন্তু এই যে চবম আধ্যাত্মিক-বোধ আব এই যে জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য, পার্থিব ভোগেব সৃজনেব আনন্দ—কেবল এই দুইটিই অতীত ভারতেব ভাব-ধাবাব সবখানি নয়। উপবে ইন্দ্রনীল আকাশের প্রশান্ত অনন্ত বিস্তাব আব নীচে গ্রীষ্মতাপে উত্তেজিত উর্ব্বর বনভূমির উচছৃঙ্খল সম্পদ—ভারতেব চিত্র এরূপ নহে। একযোগে এতখানি ঐশ্বর্য্য দেখিবার অভ্যাস যাহার নাই, তাহাবই দৃষ্টিতে বোধ হয়, এই যে সব জাযগা জুড়িযা অলঙ্কারে ভরিয়া রূপ ফলাইযা তুলিবাব প্রয়াস, ইহা কেবল

উচছৃঙ্খল আতিশয্যের বিলাস, এখানে তাল মানেব, সুঠাম গঠনেব, পবিষ্কাব সামঞ্জস্যেব নিতান্তই অভাব ; এখানে আছে শুধু বিরাট হট্টগোল। ভাবতেব অন্তরের ছিল আব একটি ভাব-ধারা—সেটি হইতেছে সমর্থ বিচারবুদ্ধি। এই বৃত্তিটি তাহার একদিকে যেমন ছিল স্থির আত্মস্থ, অন্যদিকে তেমনি ছিল বহুমুখী। একদিকে যেমন চলিত বৃহৎকে আলিঙ্গন কবিতে, অন্যদিকে তেমনি চলিত ক্ষুদ্রের মধ্যে প্রবেশ কবিতে ; তাহা যেমন ছিল শক্তিমান, তেমনি ছিল নিপুণ—তত্ত্বকে যখন সে ধরিতে যায় তখন বিবাট বিশাল তাহার গতিচ্ছন্দ, আবাব ক্ষুদ্র বস্তুকে লইযা যখন তাহার কারবার, তখন সেখানে তেমনি পাই—পদে পদে পুঙ্খানুপুঙ্খ অতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসা। এই যে বিচাববুদ্ধি, তাহাব প্রধান লক্ষ্যই ছিল শৃঙ্খলার দিকে—তবে সে-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল ভিতরেব একটা নিয়মেব, বস্তুর অন্তরের সত্যেব উপবে। ভাবত ভিতবের, অন্তরের দিকে তাকাইয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা পরম নিষ্ঠা সহকারে পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছে সেই ভিতরের অন্তরের জিনিষকে কি কবিযা বাহিরে প্রযোগের মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া ধবা যায়। কাবণ, ভাবত হইতেছে ধর্ম্মেব ও শাস্ত্রের পীঠস্থান। ব্যষ্টিগত হউক আব বিশ্বগত হউক, প্রত্যেক কর্ম্মচেষ্টাব ভিতরেব সত্য কি, ছন্দ কি অর্থাৎ ধর্ম্ম কি, ভারত তাহাই খুঁজিয়াছে। সেইটি যখন সে পাইযাছে, তখন তাহাকে বাস্তব জীবনের ধারায় ঢালিবার চেষ্টা কবিয়াছে, নানা রূপেব মধ্যে, খুঁটিনাটি জটিলতার মধ্যে, সাজাইয়া গুছাইয়া ফলাইয়া ধবিতে চাহিয়াছে। ভার-

তের আদিযুগ উদ্ভাসিত অধ্যাত্মের আবিষ্কারে। ভারতের মধ্য-যুগে শেষ হইল ধর্ম্মের আবিষ্কার। আর সর্ব্বশেষ যুগে শাস্ত্র আনিয়া দিল প্রযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বহুল জটিল বিধি বিধান। এই তিনটি ধারা তাই বলিয়া আবার পরস্পর পরস্পর হইতে একান্ত পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কখনও ছিল না, তাহারা একসঙ্গেই সর্ব্বদা চলিযাছে।

সমস্ত জীবনটি বিচিত্র রকমে নানা ভঙ্গীতে ফলাইয়া খেলাইয়া তুলিবার জন্যই ভারতে গড়িয়া উঠিল যত বিদ্যা, যত শাস্ত্র, তাহাদের চরম অভিব্যক্তি পাই এই শেষ যুগে। অশোকের সময় হইতে মুসলমানদের আগমনেব অনেক পরে পর্য্যন্ত—এই সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া ভাবতের সজাগ মস্তিষ্ক যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, আর কিছু নয়, কেবল তাহাব পরিমাণটি দেখিলেই চমৎকৃত হইতে হয়। এ কথাব প্রমাণ সম্প্রতি গবেষকমণ্ডলীই দিতেছেন। তবুও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এখনও যাহা পড়িয়া আছে, তাহার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, আব এখনও যাহা আছে, তাহা আবার এককালে যাহা ছিল তাহাব অতি সামান্য ভগ্নাংশ। মুদ্রাযন্ত্রের যখন আবিষ্কাব হয় নাই, আধুনিক বিজ্ঞান যখনও তাহার সুখ-সুবিধা লইয়া দেখা দেয় নাই, তখন এই যে বিপুল জ্ঞানের সৃষ্টি ও প্রসার চলিয়াছিল, তাহার তুলনা আর কোথাও মিলে না। আমরা আজ যে সব সহায় সুযোগের অধিকারী, তাহা কিছু না পাইয়াও এক স্মৃতিশক্তিকে আশ্রয় করিয়া আর ক্ষণভঙ্গুর তালপত্রকে

ভর করিয়াই বিকাশ পাইয়াছে সেই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা, সেই সব অজস্র রচনা। এই বিশাল অতিকায় সাহিত্য কেবল যে দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব, যোগ ও সাধনা, কাব্য নাটক, অলঙ্কার ব্যাকরণ, চিকিৎসা, জ্যোতিষ লইযাই ব্যাপৃত ছিল, তাহা নয়। সমস্ত জীবন ইহা জুড়িযা ছিল—বাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, চিত্রবিদ্যা হইতে নৃত্যবিদ্যা পর্য্যন্ত যাবতীয চতুঃষষ্টিকলা, যাহা কিছু এই পৃথিবীতে মানুষেব কাজে আসিতে পাবে বা যাহাতে মানুষেব মন আকৃষ্ট হইতে পাবে, সমস্তই এখানে ছিল। এমন কি, অশ্ব ও হস্তী কিরূপে লালন পালন কবিতে হয়, তাহাব অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পাওযা যায। আর এই সব প্রত্যেক বিষয় লইযা এক একটি পৃথক্ শাস্ত্র গড়িযা তোলা হইয়াছিল, প্রত্যেক বিদ্যারই ছিল নিজেব নিজের একটা পবিভাষা, নিজের নিজের একটা বিশাল সাহিত্য। বিষয় খুব বৃহৎ খুব প্রয়োজনীয় হউক আর অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর হউক; সে সকলেব চর্চ্চায সর্ব্বত্রই সমভাবে ভারত ঢালিয়া দিয়াছে সেই একই উদার ঋদ্ধ সূক্ষ্ম চরম বিচারবুদ্ধি। এক দিকে ছিল তাহার একটা অতর্প-ণীয় কৌতূহল. জীবনেব প্রত্যেক খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিবার আকাঙ্ক্ষা; আবার আর একদিকে ছিল তেমনি শৃঙ্খলাব উপর, পরিপাটি করিয়া সাজান-গোছানর উপর একটা সহজ টান; সকল জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন কবিয়া, ঠিক ঠিক মাত্রাটি ছন্দটি ধরিয়া জীবনের পথে চলিবার একটা নিবিড সঙ্কল্প। উপরে সমস্তকে ব্যাপিয়া ছিল ভারতের আপন মজ্জাগত

সহজাত আধ্যাত্মিকতা, নীচে কর্ম্মজগতে তাহাব ছড়াইয়া ছিল একটা অফুবন্ত প্রাণশক্তির সৃজন-প্রতিভা, সতেজ জীবন-ধাবাব উদাত্ত আবেগ আব এই দুইএর মাঝখানে, দুইটিব মধ্যে আদান-প্রদানেব সেতু তুলিযা ধবিযাছিল এমন একটি সমর্থ, তীক্ষ্ণ, সতর্ক বিচাববুদ্ধি, যাহা কেবল যুক্তিব ক্ষেত্রে নয, কিন্তু কর্ত্তব্যেব ক্ষেত্রে, বসজ্ঞতাব ক্ষেত্রেও—এই তিনটি ধাবাব প্রত্যেকটিতে চবম স্পষ্টতৎপবতাকেই অনুপ্রাণিত কবিযাছিল। প্রাচীন ভাবতেব শিক্ষাদীক্ষায় পাই যে অপরূপ সামঞ্জস্য, তাহা এইরকমেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ফলতঃ, এতখানি জীবনীশক্তি, এতখানি বিচাববুদ্ধি যদি না থাকিত তবে ভারত তাহাব আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি লইয়া যাহা কবিযাছে, তাহা কখনও করিতে পাবিত না। প্রাণশক্তি যেখানে অর্দ্ধমৃত, বুদ্ধিবৃত্তি যেখানে অবজ্ঞাত, নিপীডিত, সেই বিক্ত মাটিতেই যে আধ্যাত্মিক-প্রতিভা সবচেযে ভাল ফুটিযা উঠে—ইহা মস্ত ভুল ধারণা। এইভাবে যে আধ্যাত্মিকতা ফুটিযা উঠে, তাহার মধ্যে থাকে একটা অস্বাস্থ্যেব, দুঃস্থতাব অস্বাভাবিক উগ্রতা, পরিণামে তাহার একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া আসিতে বাধ্য। বরং যে জাতি যত সমৃদ্ধ জীবন যাপন করিয়া আসিযাছে. যত নিবিড়ভাবে চিন্তা করিযা আসিয়াছে, সেই জাতিব আধ্যাত্মিকতাও হয তত সমুন্নত, তত সুগভীর, তত বৈচিত্র্যময, প্রতিপদে তত ফলপ্রসূ। ইউরোপ এই এতদিন ধরিয়া যে বিপুল জীবনীশক্তি, বিবাট চিন্তাশক্তির খেলাই খেলিয়া আসিয়াছে, তার

ফলেই ত বর্ত্তমানে আজ দেখিতেছি তাহাব মধ্যে একটা সত্যকাব আধ্যাত্মিক-জিজ্ঞাসা জাগিযা উঠিবাব উপক্রম হইযাছে। ইউবোপেব আধ্যাত্মিকতা একদিন ছিল জীবনরূপ মহাব্যাধির দীন ভিষক্, শুধু আজ সেই আধ্যাত্মিকতাব মধ্যে ধীবে ধীবে ফুটিয়া উঠিতেছে একটা উদাব গভীর প্রশান্ত দৃষ্টি। ভাবতেব অধ্যাত্ম-সাধনাব ধাবায যে জিনিষটি ইউবোপেব চোখে লাগে, তাহা হইতেছে বৌদ্ধেবা ও মাযাবাদীবা প্রচাব কবিযাছেন যে বৈবাগ্য, জীবনেব প্রত্যাখ্যান। কিন্তু স্মবণ বাখা উচিত যে, এটি হইতেছে ভাবতেব দার্শনিক চিন্তা-ধাবাব একটিমাত্র দিক্, আব এই দিক্‌টিব উপব অত্যধিক জোব পডিয়াছিল তখন, ভাবত যখন অবনতির পথে। তাছাড়া, আমবা পূর্ব্বেই বলিযাছি, ভাবতেব জিজ্ঞাসা-বৃত্তিব ধবণই ছিল এই বকম, কোন একটি তত্ত্বকে পাইলে—সে তত্ত্ব আধ্যাত্মিক হউক আব আধিভৌতিক হউক—কেবল সেইটিকে ধবিয়া কতদূব কোথায চলিযা যাওযা যায, তাহা সে পবীক্ষা কবিযা দেখিতে চাহিত। প্রত্যেক বিষযটি ভারত এই বকমে একান্ত কবিযা দেখিত, তাহাব অন্তর্গত সকল খুঁটিনাটিব পুঙ্খানু-পুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণেব জন্যও বটে, আবাব তাহাব মধ্যে আছে কোন্ অনন্ত, কোন্ চবম নিত্য-সত্য—কোন্ অতলেব, কোন্ সমুচ্চের শেষ সীমা, তাহাই আবিষ্কাব করিতে। ভারত জানিত যে, সাধারণ সহজ মানুষেব মন হইতেছে তামসিক স্থিতিশীল—জ্ঞানের চিন্তাব উপলব্ধির পথে নূতনের প্রতি, অবাধ অগ্রগতিব প্রতি তাহা বাধা দিয়াই দাঁড়ায ; আব মনেব গতির মধ্যে একটা আতিশয্য,

অতিমাত্রা না থাকিলে সে বাধা ভাঙ্গিয়া ফেলা যায় না। তাই ভারত এই আতিশয্যের অতিমাত্রার পথে চলিয়াছিল অসীম সাহসে অথচ অটুট পদবিক্ষেপে। তাই দার্শনিক চিন্তার, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রত্যেক ধাবা, প্রত্যেক উপধারাব জের শেষ পর্য্যন্ত সে টানিয়া চলিযাছিল সেই শেষ প্রান্ত হইতে সমগ্র সৃষ্টিকে কি বকম দেখায, সেইখানে দাঁড়াইয়া কোন্ সত্য, কোন্ শক্তিকে অধিকার কবা যায়, তাহা পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। ভাবত যখন জানিতে চাহিল অতিপ্রাকৃতকে, পবাপ্রকৃতিকে, তখন প্রকৃতি ছাড়াইয়া যত উপবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তাহার চেষ্টা সে কবিল, দিব্যধর্ম্মেব খোঁজে গিযা দেবতাদেব লোকও পার হইযা চলিযা গেল। ঈশ্বর পর্য্যন্ত তাহাব চোখে ছোট হইয়া পড়িল—আধ্যাত্মিক নাস্তিকতার চরম সে দেখাইল ব্রহ্মবাদে, শূন্যবাদে। আবাব যখন বিপবীত দিকে চলিল তখনও দুবন্ত সাহসে সোজাসুজি খোলাখুলি প্রচাব কবিল একেবারে জড নাস্তিকবাদ—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—তাহার মধ্যে কোন রকম ধর্ম্মবুদ্ধি বা সাধুগিরিকে এতটুকু আমল সে দেয নাই। অবশ্য এই ভাবটা ভাবতের ছিল খুব একটা অবাস্তব দিকেব কথা, ভারতের যে চিরপিপাসু জিজ্ঞাসা-বৃত্তি তজ্জনিত একটা খেয়াল মাত্র।

সকল ক্ষেত্রেই দেখি এই একই ধাবা। ভারতে যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে এক দিকে পাই যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠাব, চরম-স্বাতন্ত্র্যের, প্রভুত্বেব, ভোগাধিকারের জন্য অদম্য তৃষ্ণা; অন্যদিকে ঠিক তেমনি পাই আত্মত্যাগের চরম—নিজেকে

সর্ব্বতোভাবে ঢালিযা মুছিয়া দিবাব জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা। জীবনযাত্রায় যখন সে ধনদৌলত চাহিযাছে, তখন রাজাব ঐশ্বর্য্যও তাহাকে তৃপ্ত কবিতে পারে নাই; আবাব দাবিদ্র্যকে যখন সে বরণ কবিয়া লইয়াছে, তখন একেবারে দিগম্বর হইযা বসিতেও তাহাব কোন কুণ্ঠা হয় নাই। বিশেষ ভাব বা আদর্শ তাহাব যতই প্রিয় হউক, বিশেষ আচাব রীতি তাহার যতই অভ্যস্ত হউক, ভাবতেব জ্ঞানের দৃষ্টি কোন দিন তাহার মধ্যেই একান্ত বদ্ধ অন্ধ হইযা পড়ে নাই। সমাজ-শৃঙ্খলাব জন্য একদিন তাহাকে জাতি-ভেদের স্থূল কাঠামটিকেই আঁকড়িযা ধরিয়া পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সে এ ভুলটি কবে নাই যে, মানুষের অন্তবাত্মাকে, মানুষের মনকে কখন জাতির পাঁতিতে বাঁধা যাইতে পাবে। তখনও নীচাদপি নীচের মধ্যে সে দেখিয়াছে নারায়ণকে। ভারত বৈষম্যের উপব জোর দিয়াছে যেন ফিরিয়া আবার সেই বৈষম্যকে অস্বীকাব করিবাব জন্যই। অবস্থা ও প্রয়োজনেব বশে বাষ্ট্রক্ষেত্রে একদিন তাহাকে বাজ-তন্ত্রকেই অত্যধিক পরিমাণে বড় করিযা ধবিতে হইযাছিল, বাজাকে 'নর-দেবতা' বলিযাই ঘোষণা করিতে হইযাছিল। দেশেব শক্তিকে এক কেন্দ্রে সংহত না করিয়া, চারিদিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে বলিয়া আগে যে ছিল প্রতিনিধি-শাসিত পৌর-রাষ্ট্র সব সেগুলির ধ্বংসসাধনই তাহাকে করিতে হইয়াছিল। বিভিন্ন পৌর-বাষ্ট্রের পবস্পবেব মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ সম্মিলনও দেশের একত্বের পক্ষে যথেষ্ট

বলিয়া বিবেচিত হয নাই। ভাবতের মাটিতে তাই গণতন্ত্রের বিকাশ হইতে পাবে নাই। কিন্তু তবুও গণতন্ত্রের যে মূল তত্ত্ব, তাহাব প্রয়োগ আমবা যথেষ্ট পাই. গ্রাম্য-সংহতিব মধ্যে, পৌর-জানপদ-সভাসমিতিব মধ্যে, এমন কি, জাতিবন্ধনেব মধ্যেও। জনসাধাবণেব মধ্যেও সকলেব আগে ভাবতই ভাগবতশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত কবিযাছিল এবং বাজা যখন প্রভাবপ্রতিপত্তির চবম শিখবে দাঁড়াইযা, তখনই তাঁহাব মুখের উপবে সে বলিয়া উঠিযাছে, 'হে বাজন্! জনসাধাবণেব প্রধান দাস—গণদাস ছাড়া তুমি আর কি?' ভাবত সত্যযুগের যে কল্পনা কবিযাছে, তাহা হইতেছে আধ্যাত্মিক অবাজকতা। এই আধ্যাত্মিকতাকেও ভারত একেবারে চবম সীমায় ঠেলিয়া লইয়াছিল; তবুও ত একটা সুদীর্ঘ যুগ ধবিযা ইন্দ্রিযগ্রাহ্য জীবনের, স্থূল ভোগেব রহস্যও তলাইযা দেখিতে সে বিবত হয় নাই—এখানেও অন্নময় আয়তনেও সে চাহিযাছিল সকল রকম 'অণোবণীযান্ মহতো মহীয়ান্' সিদ্ধিব সম্পদ, সকল রকম তীব্র-গভীব অনুভব উপলব্ধি। তবে এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য কবিবাব আছে। ভারত এই যে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত, পবস্পববিরোধী পথে যুগপৎ ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে কখন কোন বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয নাই। সুখবাদী হইয়া পড়িলেই ইউরোপকে আমবা একাধিকবাব দেখিয়াছি যে-রকম অবাধ অনাচাবে ডুবিয়া যাইতে. ভাবতে অতি ঘোর সুখবাদের যুগেও তাহাব তুলনা কিছু পাই না। কারণ, ভারতের আছে একটা আধ্যাত্মিক, একটা নৈতিক প্রতিষ্ঠা; শুধু তাই

নয, ভারতের চিন্তাশীলতা ভারতেব সৌন্দর্য্যবোধও এই বিষয়ে ভাবতকে রক্ষা করিয়াছে। চিন্তাশীলতাব মধ্যে আছে নিয়মানুবর্ত্তিতা, সৌন্দর্য্যবোধেব মধ্যে আছে ছন্দের বোধ উভয়েই বিশৃঙ্খলতাব পরিপন্থী। ভারত সব বিষযেই একেবাবে অতিমাত্রায গিয়া পৌঁছিযাছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই অতিমাত্রাব মধ্যেই সে আবাব মাত্রা প্রতিষ্ঠা কবিযাছে, তাহার প্রয়োগে খুঁজিযা বাহিব কবিয়াছে একটা নিয়ম, তাল মান, সুষ্ঠু রূপাযণ। তা ছাডা. অতিমাত্রাব দিকে এই তীব্র টানেব সাথে সাথেই ভারতের সহজাত স্বভাবসিদ্ধ ছিল আব একটি বৃত্তি—সামঞ্জস্যের বৃত্তি, বহুকে, নানাকে. একেব অখণ্ডেব মধ্যে সাজাইবাব কৌশল। ইহারই কল্যাণে, প্রত্যেক গতিধাবাব চূড়ান্ত জেব টানিযা আবাব সে ফিরিযা আসিয়াছে, এইভাবে যে সব জ্ঞান সে আহবণ কবিয়াছে তাহাদিগকে আবাব মিলাইয়া এক কবিযা লইযাছে. কর্ম্মসাধনায প্রতিষ্ঠানবচনায স্থাপিত কবিযাছে একটা সঙ্গতি, সম্মেলন। গ্রীক-জাতি ছন্দ ও সঙ্গতি পাইয়াছিল নিজেকে সর্ব্বদা সীমাব ভিতবে বাঁধিয়া বাখিয়া—সীমানা কাটিয়া কাটিয়া; কিন্তু ভারতেব ছন্দ ও সঙ্গতিব মূল তাহাব বিচাববুদ্ধি, তাহাব শ্রেযোবোধ, তাহার রসানুভূতির সহজ-শৃঙ্খলা, তাহার মনেব ও প্রাণেব সুসমঞ্জস প্রেরণা।

এই তথ্যগুলি এমন কবিয়া বিশদভাবে বলিতে হইতেছে, কারণ, অনেকে এ সব কথা সহজেই ভুলিয়া যান—তাঁহাদেব দৃষ্টি আবদ্ধ কেবল শেষ দিকের কয়েকটি যুগে ভারতেব চিন্তা

ও ভাবে যে সকল ধরণ-ধারণ অতিকায হইয়া ফুটিয়া তাহাবই মধ্যে। কিন্তু শুধু এইগুলিবই উপবে জোর দিযা চলিলে ভারতের অতীত সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাতে অনেক ফাঁক, অনেক ভুল থাকিয়া যাইবে; ভাবতেব শিক্ষাদীক্ষার অর্থ কি, কোন্ নিবিড় অনুপ্রেরণায সে চলিয়াছে, তাহাব অখণ্ড রূপ আমরা কখনও ধবিতে পাইব না। অতীত চলিযা যাইতে যাইতে ভাটার মুখে যে শেষ পলিমাটি বাখিযা গিযাছে তাহাই হইতেছে বর্ত্তমান। এই বর্ত্তমান হইতেই আবাব ভবিষ্যতের আবম্ভ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বর্ত্তমানের মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে ভারতের সমস্ত অতীত—তাহা নষ্ট হয় নাই, নবরূপ ধরিয়া আপনাকে আবাব প্রকাশিত করিবার জন্যই তাহা গোপনে অপেক্ষা করিতেছে। ভারতেব ছিল যে একটা বিপুল সৃজন-প্রতিভা তাহাতে যখন ভাটা ধবিয়াছে তখনই বলি আসিয়াছে অবনতির যুগ। সেই সৃজন-প্রতিভাকে যদি সম্যক্ হৃদযঙ্গম করিতে আমবা চাই, তবে তাহাকে দেখিতে হইবে তাহাব ভরা জোয়ারের যুগে। ভারতের নবজন্ম অর্থ, আবার সেই জোয়াবের আবির্ভাব, সেই জোয়ারের প্রাণ যাহা ছিল—রূপ হয় ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইতে পারে—তাহারই পুনর্বিকাশ। সুতরাং ভাবতের নবজন্মের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচার করিয়া দেখিতে হইলে, কি সব শক্তি তাহাব ফুটিবে, কতদূব তাহার প্রসাব হইবে, তাহা খোঁজ করিতে হইলে, আমাদিগকে এই চলিত ধারণাটি ভুলিয়া যাইতে হইবে যে, বিষয়-বিমুখ পরত্র-মুখী দাশনিক তত্ত্ববিচারই ছিল ভারতের

জীবনেব একমাত্র সুর এবং ইহারই মধ্যে ভাবতের সব সৃষ্টির সব ছন্দ ডুবিযা তলাইয়া গিয়াছে। তাহা নহে, ভাবতের জীবনেব মূল সুর দিয়াছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি—আর সে সুর মোটেও একটানা একঘেযে নয়, বঙের বেখাব খেলায,—রূপবৈদগ্ধ্যে—তাহা বহু বিচিত্র, যেমন তাহা সহজে নানাদিকে নানাভাবে আপনাকে বিস্তৃত, প্রসারিত করিযা দিযাছে তেমনি আবাব ঊর্দ্ধ্ব হইতে ঊর্দ্ধ্বে, উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিয়া আপনার একাগ্র তীব্রতাব পবিচয দিয়াছে। অবশ্য এই আধ্যাত্মিকতার সুরটিই আর সকল সুব ছাপাইযা উঠিয়াছে, এইটিই বহিযাছে গোড়ায়, সদা সর্ব্বদা বাবে বাবে এইটিই আসিযা দেখা দিয়াছে, আর যাহা কিছু তাহা দাঁড়াইয়াছে ইহাকেই ভিত্তি কবিযা। ভাবতের গবিমার প্রথম যুগ ছিল এই রকম এক বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার যুগ। জীবনের সত্য তখন সে এক মনে এক চিত্তে খুঁজিয়াছে, একটা সাক্ষাৎ-বুদ্ধি, অপরোক্ষ-দৃষ্টির সহাযে—বাহিবের ও ভিতবেব, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের বিষয একটা অন্তর্ম্মুখী অনুভবেব ও জ্ঞানের ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিযাছে ও ব্যাখ্যা দিয়াছে। এই গোড়ার আরম্ভ তাহার উপব যে ছাপ দিয়া গিযাছে, ভাবত কোনদিনই তাহা হারায নাই—বরং যুগের পর যুগে অধ্যাত্মজগতের নূতন নূতন উপলব্ধি, নূতন নূতন আবিষ্কাব দিয়া দেশের জীবনধারা তাহাকে সমৃদ্ধ, উপচিত কবিয়াই চলিযাছে। অবনতির যুগেও ভারত সব হারাইযা বসিযাছিল, কেবল এই জিনিষটি হারাইতে পারে নাই।

কিন্তু এই যে আধ্যাত্মিক ঝোঁক, তাহা শুধু উপবেব দিকে, বস্তুকে বিসর্জন দিতে দিতে কেবল সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিকে, যাহা গুপ্ত যাহাকে ধবা-ছোঁযা যায় না, কেবল তাহারই দিকে যে উঠিয়া চলে এমন নয়। এই আধ্যাত্মিকতাই আবার নীচের দিকে, বাহিবে চাবিপাশে আপনাব আলো ছড়াইয়া দেয়, চিন্তাজগতেব সকল বহুল বৈচিত্র্য, জীবনেব সকল বিপুল ঐশ্বর্য্যই, আলিঙ্গন করিযা ধবে। তাই ভাবতেব গবিমার যে দ্বিতীয় যুগ, তখন আসিয়া দেখা দিল বিচাববুদ্ধি, নৈতিক আদর্শ, আধ্যাত্মিক সত্যের দীপ্তিতে জীবনকে গঠিত নিয়ন্ত্রিত কবিবাব জন্য জ্ঞানপ্রবুদ্ধ প্রচণ্ড কর্ম্মৈষণা। আত্মজ্ঞানের যুগের পর আসিল ধর্ম্মের যুগ, বেদ ও উপনিষদের পরে আসিল কর্ম্মের সৃষ্টির যুগ; ভাবত তখন বীববিক্রমে তাহাব সমাজ-প্রতিষ্ঠান, তাহার চিন্তাব আয়তন, তাহার দর্শনকে ঢালিয়া পিটিয়া তাহাদের মূল রূপ সব গডিযা তুলিতে সুরু কবিল। ভাবতেব জীবনধারা ভাবতেব শিক্ষাদীক্ষাব যে বাহিবেব কাঠাম, তাহার মোটামুটি আকাব এই যুগেই চিরকালেব জন্য স্থিবীকৃত হইল, ভবিষ্যতে যে সব নূতন সৃষ্টি হইবে তাহারও বীজ এই যুগেই উপ্ত হইল। এই সতেজ চিন্তাবৃত্তির খেলা যখন ক্রমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমাজনীতি, রাজনীতি সমস্ত প্রাকৃত জীবনেরই ব্যাপার ধবিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খের সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসায় বিকশিত মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল তখনই এই যুগের পূণ পরিণতি, তখনই আসিল, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা বলিযা থাকেন সংস্কৃত

শিক্ষা-দীক্ষার 'ক্লাসিকাল্' যুগ। এই যুগেই হইয়াছিল সৌন্দর্য্য-বোধেব চবম বিকাশ,—সকল রকম হৃদয়বৃত্তির, ইন্দ্রিয়ানুভবের—কেবল তাই নয়, ভোগের ও ইন্দ্রিয়পবতার রহস্যও ভারত এই যুগেই খুঁজিয়া খুঁড়িয়া দেখিয়াছিল। কিন্তু প্রাণের ও মনের এই বিপুল ক্রিয়াশীলতাব পিছনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল ভাবতের প্রাচীন অধ্যাত্ম-বোধ। তাই দেখি, এই যুগের শেষভাগে ভাবতের সাধনা হইযাছিল সমস্ত নিম্নপ্রকৃতিকে উপবে তুলিযা ধরিতে, অধ্যাত্মেব প্রভায তাহাকে মণ্ডিত কবিতে। পুরাণের, তন্ত্রের, ভক্তিমাগেব যে সাধনা, তাহার অর্থই এই। এই ভাবই পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিল ভাবত-প্রতিভাব অন্তিম দীপ্তি উত্তরকালের বৈষ্ণব সাধনায়। বৈষ্ণব সাধনা চেষ্টা করিয়াছিল, মানুষের মধ্যে আছে যে রসানুভূতিব, হৃদযবৃত্তিব, ইন্দ্রিয়গত লিপ্সাব স্তব, তাহাকে তুলিয়া ধরিযা অধ্যাত্মের সেবায় নিয়োগ কবিতে। যে দৃষ্টি দিয়া ভারত তাহার জীবনযাত্রা সুরু করিযাছিল, এই রকমে ঘুরিয়া আবার সেইখানেই আসিযা পৌঁছিল।

এই পূর্ণ পবিক্রমার পবে আরম্ভ ভারতের অবনতির যুগ। সে অবনতিব সূচনা হইল তিনটি লক্ষণ দিয়া। প্রথমতঃ, ভারতেব ছিল যে প্রচুর পরিপ্লাবী প্রাণশক্তি তাহার প্রবাহ স্তিমিত হইয়া আসিল, ছিল যে জীবনের আনন্দ, সৃজনের আনন্দ, তাহাতেও মলিনতা ধরিল্। তবুও অধঃপতনের মধ্যেও ভারত যে সামথ্য দেখাইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক।

খুব অল্প সময়ের জন্যই সে সামর্থ্যটুকুও চলিয়া গিয়া প্রায় দেখা দিয়াছিল তামসিকতার পূর্ণগ্রাস। কিন্তু তাহা হইলেও অতীতের বিরাট্ মহত্ত্বের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে কি রকমে ভারত ক্রমাগতই অধঃপতনের দিকে অব্যর্থভাবে চলিয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারত হাবাইল তাহার পুরাতন যুগের স্বাধীন চিন্তাবৃত্তির অবাধ খেলা—তাহার সজাগ সত্যজিজ্ঞাসা, তাহার তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি মলিন হইয়া আসিল, মলিন হইয়া আসিল তাহার সৃষ্টিক্ষম দৃষ্টি। যাহা রহিল তাহা ক্রমেই পুরাতন জ্ঞানের অবোধ চর্ব্বিতচর্ব্বনে পর্য্যবসিত হইযা চলিল। অতীতের সজীব বুদ্ধি যে সজীব রূপ সব সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই ভগ্নাবশেষের মধ্যে ভারতের জীবন-মন নিথর জড়ত্ব পাইয়া বসিল। শাস্ত্রেব প্রমাণেব যে মর্ম্ম. যে অথ, তাহা লোপ পাইল, সেখানে দেখা দিল শুষ্ক বিধিনিষেধের অকাট্য আদেশ। আদেশের পিছনে যেখানে প্রাণের অভাব, সেখানে আদেশ হইবে যে অত্যাচার তাহা ত স্বাভাবিক। পরিশেষে, আধ্যাত্মিকতাও কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকিল বটে, কিন্তু তাহাতে রহিল না প্রাচীন যুগের সে বৃহৎ, সে উজ্জ্বল জ্ঞানতেজ; এখানে ওখানে সময়ে সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে তাহার তীক্ষ্ণ তীব্রধারা ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে পাই না পুরাতনের সে বিশাল সমন্বয়ের ভাব; তাহাতে দেখা দিল একদেশদর্শিতা, অন্য সকল সত্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া একটিমাত্র সত্যকেই একান্তভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবার অন্ধ প্রয়াস।

এই যে চারিদিকে ক্ষয় ধরিল, তাহার ফলে ভারত তাহার সমস্ত শিক্ষাসাধনাব লক্ষ্যটি হইতে এক রকম ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। বাহ্যজীবনের, মন-বুদ্ধিব ক্ষেত্রকে পর্য্যন্ত পূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপে রূপান্তরিত করিয়া ভাবত চলিতেছিল, সে পথে আর অগ্রসর হওয়া তাহার হইল না। যে ভাবে সে আরম্ভ করিযাছিল তাহা অপূর্ব্ব, অতুলনীয়, যে বিকাশের ধারায় চলিযাছিল তাহাও অপরূপ কিন্তু ঠিক যেখানে সুরু হওযা উচিত ছিল, পূর্ণতা, পবিণতি, নূতন সমন্বয়, নূতন উন্মেষ—সিদ্ধিব আবির্ভাব, সেই সন্ধি-মুহূর্ত্তেই প্রাচীন দীক্ষার প্রেবণা হঠাৎ থামিয়া গেল—ভারত চলিল কতক যেন পিছনে হটিযা, কতক যেন পথ হারাইয়া। তবে এ কথা সত্য, আসল বস্তু ছিল যাহা, তাহা একেবারেই নষ্ট হইতে ভারত দেয় নাই—শুধু স্মৃতি, অন্ধ অভ্যাসেব আচাবেব মধ্যেই নয়, কিন্তু দেশের প্রাণেব মধ্যেই তাহা বর্ত্তিয়া বহিল ও এখনও রহিয়াছে। কিন্তু ভিতরের সেই বস্তুর প্রকাশেব পথ নানা জালজঞ্জালে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল—তাহাব ক্রিয়ায দেখা দিল নানা বিকৃতি। এই রকম অবস্থা হইল কেন, অন্তরের ও বাহিরেব কোন্ কারণ-পরম্পবায়, সে কথা এখন আমবা বিচাব করিব না। যে কারণেই হউক, অবস্থা দাঁড়াইল এই ; আব ইহারই দরুণ ঠিক এই সময়েই ভারতকে যে একটা অভিনব, অভূতপূর্ব্ব ঘটনাচক্রের সম্মুখীন হইতে হইল, তাহাতে দেখি ক্ষণকালের জন্য সে অসহায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

কারণ, এই সময়েই ভারতের উপর আসিয়া পড়িল ইউ-রোপের বন্যা। সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষাদীক্ষার সহিত সংঘর্ষের প্রথম ফল হইল এই যে, প্রাচীন যাহা কিছুর আর বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবার সামর্থ্য ছিল না তাহা অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গেল, অনেকানেক জিনিষ গলিয়া নূতনের কুক্ষিগত হইল; বাকী যাহা রহিল তাহাদের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া চলিল। সেই সাথে নূতন একটা কর্ম্মোদ্দীপনাও দেখা দিল বটে, কিন্তু প্রথম প্রথম তাহার লক্ষ্য হইল বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার স্থূল বিশৃঙ্খল যেন তেন অনুকরণ। ভারতের পক্ষে সত্যই এ একটা ছিল দারুণ সঙ্কটের—ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত্ত। তাহার প্রাণশক্তি যদি স্বভাবতই এতখানি প্রচুর ও সমর্থ না হইত, তবে একদিকে আপনকার পুরাতন আদর্শের মৃত ভার, আর একদিকে পরধর্ম্মের অন্ধ অনুকরণ, এই দুইদিকের চাপে সে প্রাণশক্তি যে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইত, লোপ পাইয়া বসিত, সেই সম্ভাবনাই ছিল বেশী। এই ধরণের অবস্থায় পড়িয়া এক একটা দেশ ও জাতি যে কি ভাবে উৎসন্ন যাইতে পারে, তাহার সাক্ষ্য ইতিহাসই দিয়াছে। কিন্তু ভারতের সৌভাগ্য, তাহার জীবনীশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই; তাহা ছিল শুধু সুপ্ত—তাই ব্যাধির প্রতিকার সে পাইল নিজেরই ভিতরে। ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার রূঢ় সংঘাতের ফলে তাহার জীবনে সাময়িকভাবে যতই পচ্ যতই ক্ষয় ধরুক না কেন, সেইখান হইতে আসিল ভারতের তখন প্রয়োজন ছিল যে তিনটি প্রেরণা।

প্রথমতঃ, সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল তাহার সুপ্ত চিন্তাবৃত্তি, বিচারশক্তি। দ্বিতীয়তঃ, তাহার জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল, তাহার মধ্যে ফুটিল নূতন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ; আর তৃতীয়তঃ, অভিনব সব অবস্থা ও আদর্শের সাক্ষাৎ সম্মুখে পড়িয়া ভারতের নবশক্তিকে তাহাদের সহিত বাধ্য হইয়া বুঝাপড়া করিতে হইল —তাহাদিগকে দেখিবার শুনিবার, জয় করিবার, আত্মসাৎ করিয়া লইবার একান্ত প্রয়োজন তাহার হইল। ভারত নূতন এক দৃষ্টিতে আপনার প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষার দিকে চাহিল, তাহার অর্থ ফিরিয়া আবার সে হৃদয়ঙ্গম করিল, শুধু তাই নয়, আধুনিক জ্ঞানের আদর্শের সহিত তাহাকে মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। এই নবোদ্ভিন্ন দৃষ্টি ও প্রেরণা হইতেই ভারতের আসিতেছে নবজন্ম, ইহাই নিয়ন্ত্রিত করিবে ভবিষ্যতের ধারা। এই নবজন্মের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজ ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা—তেমনি গভীর, সমৃদ্ধ, অখণ্ডভাবে, সকল মহিমায় ভরিয়া দিয়া। দ্বিতীয় কাজ—এই আধ্যাত্মিকতাকে দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সকল রকম অনুসন্ধানেরই নূতন রূপায়ণের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া। আর তৃতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ হইতেছে, ভারতের অন্তরাত্মার ধর্ম্ম যাহা তাহাকে ধরিয়া, তাহারই সহায়ে সম্পূর্ণ নূতনভাবে আধুনিক সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা, সমাজকে আধ্যাত্মিকতারই জাগ্রত বিগ্রহ করিয়া তুলিবার জন্য একটা বৃহত্তর সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করা। এই তিনটি ধারায় ভারতের নবজন্ম যে

পরিমাণে সফলকাম হইবে, ঠিক সেই পরিমাণেই জগতের মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে সে হইবে সহায়।

অধ্যাত্ম কাহাকে বলি? অধ্যাত্ম অর্থ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাত্ম হইতেছে সকল বীজসত্য লইয়া রহিয়াছে উপরে যে অনন্ত; আর সেই সব বীজসত্যকে ধরিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, পরিপূর্ণতার দিকে, সার্থকতার দিকে—নিজের নিজের সত্য অভিমুখে, চলিয়াছে নীচেরকার অনন্তের যে সব সম্ভাবনা তাহা লইয়াই অধিভূত বা জীবন। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ইচ্ছাশক্তি, আমাদের কর্ত্তব্যবোধ, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ—সবই এই দুই অনন্তের মধ্যে মধ্যস্থের বা দর্পণের কাজ করিতেছে। পাশ্চাত্য জীবনকেই অতিকায় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে, কিন্তু এই জীবনকে অনুপ্রাণিত শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য উপরের শক্তির আবাহন সে খুব অল্পই করিয়াছে। ভারতের পথ সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারত চাহিয়াছে আগে অধ্যাত্মকে, অন্তরে সত্য-পুরুষকে আবিষ্কার করিতে, ঊর্দ্ধতন শক্তিরাজির যত গহনতম ধারা তাহা ব্যক্ত করিয়া ধরিতে; ভারত জীবনের সামর্থ্য বাড়াইয়া তুলিতে চাহিয়াছে, সেইজন্য আগে চেষ্টা করিয়াছে জীবনকে কোন না কোন প্রকারে এমন বশীভূত করিতে, ইচ্ছামত এমন গড়িয়া পিটিয়া লইতে, যাহাতে সেখানে প্রতিফলিত প্রতিধ্বণিত হইয়া উঠিতে পারে অধ্যাত্মেরই শক্তি। একদিকে সে সহজ বৃত্তিগুলিকে সহজভাবেই ফুটাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে,—বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, কর্ত্তব্যবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ, চিত্তাবেগ প্রভৃতি মানসবৃত্তির

মনের মধ্যেই কতদূর কি সম্ভাবনা তাহা তলাইয়া দেখিয়াছে; অন্যদিকে আবার এই সকল বৃত্তিকেই সে চেষ্টা করিয়াছে মনের উপরে তুলিয়া ধরিতে, বৃহত্তর জ্যোতির শক্তির দিকে ঘুরাইয়া তাহাদের নিজেদেরই সমুচ্চ সত্য-প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত করিতে।

ভারতের নবজন্মের কাজ হইবে এই অধ্যাত্মশক্তিকে এই সমুচ্চ দৃষ্টিকে, এই গভীর প্রতিভাকে জগতের জীবনক্ষেত্রে আবার একবার সজীব সৃজনক্ষম করিয়া ধরিতে, সকল শক্তির উপরে একচ্ছত্র শক্তিরূপে স্থাপন করিতে। কিন্তু নিজের নবজন্মের এই যে ভিতরের সত্য, সে সম্বন্ধে ভারত এখনও সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিতে পারে নাই, অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছে মাত্র। বর্ত্তমানে সে যাহা কিছু করিতেছে তাহার বেশীর ভাগই ইউরোপীয় ভাবে ইউরোপীয় ভঙ্গীতে অনুপ্রাণিত। আমাদের অন্তর-পুরুষের সহিত তাহার মিল সামঞ্জস্য নাই বলিয়া, তাহা আমাদের গভীরতম সত্তা হইতে উৎসারিত হইতেছে না বলিযাই সে কাজের প্রেরণার মধ্যে তীব্রতা নাই, গড়নের মধ্যে সামর্থ্য নাই, ফলও আশানুরূপ নহে। দুই একটি ক্ষেত্রে মাত্র একটা আত্মজ্ঞানের পরিষ্কার লক্ষণ যেন দেখিতে পাই। কিন্তু যতদিন এই আত্মজ্ঞানের জ্যোতিঃ সকল দিকে, না ছড়াইয়া পড়িবে, সহজ সাধারণ হইয়া না পড়িবে ততদিন ভারতের নবজন্ম ভবিষ্যতের আশা রূপেই থাকিবে, বর্ত্তমানের বাস্তব বস্তু হইয়া উঠিবে না।

২

ভারতের নবজন্ম অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কি ধারায় এই পরিবর্ত্তনটি ঘটিতেছে, এই একটা জটিল ভাঙন ও পুনর্গঠনের কাজ চলিতেছে। অবশ্য শেষ ফল, পূর্ণ পরিণতি এখনও দূরে ভবিষ্যতের গর্ভে, তবে গোড়ার বনিয়াদ সব ইতিমধ্যেই হয় ত গাঁথা হইয়া গিয়াছে। কোন্ পথে চলিয়া প্রাচীন এক শিক্ষাদীক্ষা রূপান্তরিত হইয়া নবযুগে পাইতেছে নব-প্রতিষ্ঠা? কারণ এ কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে, এখানে নবজাত কোন শিক্ষাদীক্ষা পুরাতন মৃত শিক্ষাদীক্ষার সহিত আপনাকে মিলাইয়া ধরিতেছে না—ভারতের নবজন্ম অর্থ সত্য সত্যই নূতন জন্ম অর্থাৎ পুনর্জন্ম। ভারতের এই পুনর্জন্মের ধারা যদি বিশ্লেষণ করি তবে দেখিতে পাই, কার্য্য-কারণপরম্পরায় এবং ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায়ও সেখানে রহিয়াছে তিনটি ধাপ। প্রথম ধাপ হইতেছে ইউরোপের সংস্পর্শে আসিয়া দাঁড়ান—ফল, পুরাতন শিক্ষাদীক্ষার অনেক প্রধান অঙ্গই আবার নূতন করিয়া যাচাই করিয়া দেখা, আর এমন কি, তাহার কতকগুলি মূল তত্ত্বকেই একেবারে বিসর্জন দেওয়া। দ্বিতীয় ধাপ হইতেছে, ইউরোপীয় প্রভাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় ভাবের প্রতিক্রিয়া—ফল, ইউরোপ যাহা কিছু দিতে চাহিয়াছিল তাহা এক রকম সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা আর দেশের

অতীতের প্রধান অপ্রধান সব বিষযেবই উপব অতিমাত্র জোর দেওযা। অবশ্য এই প্রতিক্রিযার মধ্যেও গোপনে চলিয়াছিল বাহিবের প্রভাবকে আত্মবশ করিযা, আত্মসাৎ কবিযা লইবার একটা চেষ্টা। আব তৃতীয ধাপটি সুরু হইতে চলিয়াছে বা সবে সুরু হইযাছে মাত্র। এটি নূতন স্থষ্টিব যুগ। এই নূতন স্থষ্টিতে ভাবতের অধ্যাত্মশক্তি আবার সকলেব উপব স্থান লইযাছে, আবিষ্কাব কবিতেছে আপনাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপলব্ধ সত্য সব, আধুনিক ভাবেব মধ্যে, রূপেব মধ্যে যাহা প্রয়োজনীয়, যাহা অপবিহার্য্য, যাহা সত্য, যাহা সুস্থ দেখিতেছে তাহাই গ্রহণ করিতেছে কিন্তু সে সব এমনভাবে আত্মসাৎ কবিযা রূপান্তবিত কবিয়া লইতেছে, নিজের স্বভাবের মধ্যে এমনভাবে একীভূত করিযা ফেলিতেছে যে, তাহাদের বিদেশীয প্রকৃতি লোপ পাইযা যাইতেছে, তাহাবা হইয়া উঠিতেছে 'পুরাণী দেবী' ভারত-শক্তিবই নিজস্ব লীলায়িত প্রতিভা—স্পষ্টই সেখানে আমবা দেখি, ভারত আধুনিক প্রভাব সব অমিতবলে অধিকার করিযা গ্রাস করিয়া চলিযাছে, আধুনিকেব প্রভাব আব ভারতকে অধিকার কবিতে গ্রাস করিতে পারিতেছে না।

বিশ্ব-প্রকৃতির যে বহুল কর্ম্মধাবা, মানুষকে লইযাই হউক, আর জডবস্তু লইযাই হউক, তাহাব মধ্যে কোথাও অকস্মাৎ, বিনা কারণে কিছু ঘটিযা যায় না, অথবা বাহিবেব অবস্থাই সেখানে একমাত্র নিয়ন্তা নহে। পরিবর্ত্তনেব ধাবা যত বিপুল হউক না কেন, তাহার মূল আবেগ আসিতেছে বস্তুর অন্তরের প্রকৃতি

হইতে। ভিতরে ভিতরে যে জিনিষ যাহা, তাহাবই চাপে কর্ম্মক্ষেত্রে সে অভিনব অপ্রত্যাশিত মূর্ত্তি সব লইয়া ফুটিয়া উঠি-তেছে। ভারতের আছে যে অন্তরের সনাতনী প্রকৃতি, ভারত ভিতবে ভিতরে নিজে যাহা, তাহারই দরুণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, বর্ত্তমানের এই যুগান্তব, জটিল রূপান্তর। ভাবত যে বাতারাতি এক নিঃশ্বাসে পাশ্চাত্যের ভাব ও রূপ সব গলাধঃকরণ কবিযা ফেলিবে, নিজের অতীতেব যে সব অধিষ্টাতৃ-ভাব সেগুলি বিসর্জন দিয়া, সব্যাজে যেন ত্তেন প্রকাবেণ বিদেশীর আবহাওয়ায় আপনাকে মিলাইয়া ধরিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে—ইহা এক অসম্ভব ব্যাপাব। অবশ্য এই রকম একটা ত্বরিত পরিবর্ত্তনের ফলেই আধুনিক জাপান জন্ম লইয়াছে; কিন্তু জাপানের মত যদিই-বা ভারত বাহ্যিক অবস্থার আনুকূল্য পাইত তবুও ভাবতে সে ধরণের কিছু কখন ঘটিতে পারিত না। কাবণ, জাপান তাহার চিত্তের যে বিশেষ গড়ন বা মেজাজ, তাহাব যে রঞ্জিনীবৃত্তি বা সৌন্দর্য্য-বোধ তাহাকেই মুখ্যতঃ কেন্দ্র কবিয়া জীবন যাপন করিতেছে; সে চিরকালই পরের বস্তু কি ভাবে আপনার করিয়া লইতে হয় সেই কৌশল অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে। জাপানের আছে একটা ধাতুগত দৃঢ় নিষ্ঠা, তাহারই ফলে সে আপন জাতীয় বিশেষত্বকে অটুট রাখিতে পারিয়াছে; আর শিল্পীর যে সৌন্দর্য্যদৃষ্টি তাহারই শক্তিতে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে দেশের অন্তরাত্মাকে। কিন্তু ভারতের জীবন মুখ্যতঃ প্রতিষ্ঠিত তাহার অধ্যাত্ম-সত্তায়।

ভাবতেব তুলনায় জাপানেব প্রাণের আছে একটা উৎফুল্ল তরলতা, একটা সুলভ বেগপ্রবণতা। জাপানেব মত ভারত এত সহজেই কর্ম্মের মধ্যে মত্ত হইযা যাইতে, বাহিবের দিকে ছুটিয়া চলিতে পাবে না, অল্পেতে সাড়া দিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে না। তাই দেখি, অবস্থা অনুসাবে আপনাকে পবিবর্ত্তন কবিয়া ধবিবাব পটুতা তাহার অপেক্ষাকৃত কম; কিন্তু তাহাব যাহা আছে, তাহা হইতেছে একটা গভীরতব, নিবিড়তব ধ্যানপ্রতিষ্ঠ স্থৈর্য্য। ভারত যে কাজ কবে, তাহা কবিতে চায ধীরে সুস্থে বিচার বিবেচনা কবিতে কবিতে, ইতস্ততঃ কবিতে করিতে। তাহাব কাজ সময়সাপেক্ষ; কাবণ, জিনিষকে সে আগে লইযা চলে নিজেব গভীবত্বে; অন্তবেব এই অন্তবতম প্রদেশ—এই 'গুহাগতং গহ্বরেষ্ঠং' হইতে আবম্ভ করিয়া ক্রমে তবে বাহিবের জীবনেব যেখানে যাহা পরিবর্ত্তন কবিবার, পুনর্গঠন করিবার, তাহা সে করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরের দেওয়া জিনিষকে লইযা সে এই ভাবে আপনাব মধ্যে না ডুবিয়া যাইতে পাবিযাছে, তাহাকে নিজের অন্তর্ভুক্ত, অঙ্গীভূত না কবিযা ধবিতে পারিযাছে, যে শক্তি জিনিষকে আবাব নূতন করিযা গড়িযা তুলিবে, তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতরে ভিতবে সে প্রস্তুত না করিতে পাবিয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে নূতন পথ সে ধবিয়াছে, তাহাতে স্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিতে পারে না। ভাবতের নবযাত্রা বহুমুখী, জটিল; এই জন্যই যে সব সমস্যা তাহাব সম্মুখে উঠিতেছে তাহাদের মীমাংসা এমন দুরূহ। যতই সে অগ্রসর হইয়া

চলিয়াছে, ততই এত রকমেব মতবাদ, দেখিবার ভঙ্গী, চলিবার ধাবা, সব ফুটিয়া উঠিয়াছে মিশামিশি হইয়া এমন বিরাট্ গোল-মাল পাকাইয়া তুলিয়াছে যে সেখানে কোন স্পষ্ট নিঃসন্দেহ পরি-ণতি সহজে সম্ভব হইতেছে না—মনে হয় যেন আমরা চলিযাছি অন্ধকাবের মধ্য দিয়া অনির্দ্দিষ্ট ঘটনাচক্রের তাড়নায, ভবিষ্য-তেব লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদেব পরিষ্কাব ধারণা কিছুই নাই, ঢেউএব মত একটা আবেগে এক সময়ে উঠিযা দাঁড়াইতেছি, আবাব আর এক খেযালে পবমুহূর্ত্তে নামিযা পড়িতেছি—আমবা চলিযাছি এই ভাবে ভাসিযা ভাসিযা। তবুও একথা সত্য যে, এই সকল অনিশ্চযতাব অন্তবালে ভিতবে ভিতবে একটা লক্ষ্য নির্ণীত হইযা উঠিতেছে, তাহাব অভিব্যঞ্জনা বাহিরেও আসিযা দেখা দিতেছে। ফল তাহাব আব যাহাই হউক, সে জিনিষ যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রাচ্য সংস্করণ নহে, সে জিনিষ যে সম্পূর্ণ নূতন একটা সৃষ্টি, সমস্ত মানবজাতিব ভবিষ্যৎ শিক্ষাদীক্ষা যে তাহার উপর অনেকখানি নির্ভব করিবে, এইটুকু এখনই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পাবে।

পাশ্চাত্যশিক্ষার ফলে ভারতে সর্ব্বপ্রথম যাঁহাদেব মস্তিষ্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল—সংখ্যায় তাঁহাবা সামান্য হইলেও, প্রতিভায় ও সৃজন-সামর্থ্যে তাঁহারা ছিলেন বিশেষ শক্তিমান—তাহাদের মনেব ভাব কিন্তু এ রকমের ছিল না। তাঁহারা আশায় আশায় ছিলেন যে, অতি সত্বর একটা পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে—পরে জাপান অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত যাহা করিতে পারিয়াছিল, সেই

ধবণেব কিছু। নবীন ভারত মনে, প্রাণে, অন্তবাত্মায়, সর্ব্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আধুনিক হইয়া উঠিবে—ইহাই ছিল তাঁহাদেব পবম আকাঙ্ক্ষা। তীব্র স্বদেশপ্রেমে তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইযাছিলেন, কিন্তু তাঁহাদেব চিন্তাব ভঙ্গী ছিল বিজাতীয—আমাদেব প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষা শুধু অর্দ্ধ-সভ্যতার পরিচয়—পাশ্চাত্যেব এই অভিমত তাঁহারা স্পষ্ট কথায না হউক, কার্য্যতঃ মানিযা লইযাছিলেন। তাঁহাদের মূল আদর্শ সব পাশ্চাত্য হইতে গৃহীত, যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহাবা গঠিত হইয়াছিলেন তাহাবই ভাবে, ভঙ্গীতে, ধবণধারণে অনুপ্রাণিত। মধ্যযুগের ভারত হইতে তাঁহাবা বিদ্রোহ-ভবে সবিয়া দাঁড়াইযাছিলেন—তখনকার যাহা কিছু সৃষ্টি, সে সকলকে ধ্বংস করিতে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য কবিতে তাঁহাবা বদ্ধপরিকব হইয়াছিলেন; সেখান হইতে যদিই বা কখন কিছু গ্রহণ করিতেন, তবে কেবল কবিত্বময় অলঙ্কার হিসাবে, অথবা তাহাদেব একটা বাহ্যিক, আধুনিক অর্থ করিয়া দিয়া। প্রাচীন ভাবতের প্রতি তবুও তাঁহাবা গর্ব্বভবে চক্ষু ফিরাইয়া ধবিযাছিলেন—সব দিকে না হউক, অন্ততঃ কোন কোন দিকে। তাঁহাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে যাহাই মিলাইয়া ধবিতে পাবিযাছেন, প্রাচীনেব তাহাই সাদরে ববণ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই ভাবে কোন জিনিষেরই মূল অর্থ, সত্যকাব ব্যঞ্জনার মধ্যে প্রবেশ করিতে তাঁহাবা পারেন নাই, তাঁহাদের পাশ্চাত্য মস্তিষ্কের সাথে যে বস্তুব সামঞ্জস্য স্থাপন কবিতে অপাবগ হইয়াছেন, তাহাকেই কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিয়াছেন। ধর্ম্মকে

তাঁহারা যতদূর পারেন, বুদ্ধিবিচারের মাপকাঠি দিয়া সহজ সাদা-মাঠা যুক্তিবদ্ধ কবিয়া ফেলিলেন ; যে সাহিত্য তাঁহাবা স্বষ্টি করিলেন, তাহাব মধ্যে ইংরাজীর হাবভাব, তাহাদেব ইংবাজী আদর্শের সমস্ত প্রাণই দুইহাতে আমদানী কবিতে লাগিলেন—অবশ্য আর সকল শিল্পকলার দিকে ফিরিযাও নজর দিলেন না। রাষ্ট্রনীতিব ক্ষেত্রে তাঁহাদের আশা ও ভবসা হইল ইংরাজের অনুসরণ কবা বা হুবহু অনুকরণ কবা অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে ছিল যে মধ্যবিত্তদের কর্তৃস্বাধীন একটা অলীক গণতন্ত্র, তাহাকে সাঙ্গোপাঙ্গ তুলিযা আনিযা ভাবতে স্থাপন করা। সমাজকেও তাঁহাবা ঢালিয়া আবাব সাজাইতে চাহিযা-ছিলেন ইউবোপের সামাজিক আদশ, ইউবোপীয সমাজের গড়ন অনুসারে। এই বকম্ অন্ধ শ্রদ্ধাবশে তাঁহাবা যে যে জিনিষ আঁকড়িযা ধরিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাহাদেব কোন কোনটিব সাথকতা কিছু থাকিলেও হযত থাকিযা যাইতে পাবে ; কিন্তু যে উপায বা পথ তাঁহাবা লইযাছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল, এ কথা আজ আমবা স্বীকাব করিতেছি। ইংবাজী ভাবতবর্ষ যে কখ-নও সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় তাহা আমরা আব মনেও করিতে পারি না। ফলতঃ, ভারতবর্ষকে যদি সত্য সত্যই ইংরাজী ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে চেষ্টা কবিতাম, তবে আমরা হইয়া পড়িতাম—বড়জোর দীন নকলনবীশ, হীন অনুচর ;—দেখিতাম ইউরো-পেব পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে আমরা প্রতিপদে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইতেছি আর চিরদিনই অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পিছনে

রহিয়া গিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত সে মনের ধাবা বেশী দিন ভারতে ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না। আজকাল এখানে ওখানে তাহার দুই একটা নিদর্শন দেখা গেলেও যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রাণের স্পন্দন নাই, তাহাকে সজীব সমর্থ কবিযা তোলা দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য।

তবুও, সকল সত্ত্বেও, এই স্থূল অনুকবণেব যুগও একেবারে বিফলে যায নাই। এমন কতকগুলি জিনিষ সে সৃষ্টি করিযা দিয়াছিল, যাহা না হইলে ভারতেব নবজীবন কখন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিত না। সে সকলেব মধ্যে সব চেয়ে প্রধান যে তিনটি, তাহাদেরই কথা এখানে আমরা বলিব। প্রথমতঃ, ভাবতে আবীব জাগিযাছে মস্তিষ্কেব চিন্তাশক্তির অবাধ খেলা। প্রথম প্রথম এই বৃত্তিটি খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীব মধ্যে আবদ্ধ ছিল, বেশীব ভাগ পরেব প্রতিধ্বনি কবিযাই চলিত বটে; কিন্তু ক্রমে তাহা দেশের সহিত, মানবজাতির সহিত যে বিষয়ের কিছু সম্পর্ক আছে, তৎসমুদযেব উপবই আপনাকে ছডাইযা দিতেছে, যত দিন যাইতেছে তত দেখিতেছি তাহার অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়া যাইতেছে, যে ক্ষেত্র ধরিতেছে সেই ক্ষেত্রেই তাহার নিজস্বতা উত্তরোত্তর ফুটাইয়া তুলিতেছে। প্রাচীন ভারতের ছিল যে সকল প্রকাব জ্ঞানের জন্য একটা অশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহাই যেন আবার ফিরিয়া আসিতেছে; সেই জ্ঞানে ধীবে ধীরে প্রাচীনকালেরই প্রসারতা, গভীরতা, কার্য্যপটুতা যে ফুটিয়া উঠিবে, তাহাও সন্দেহ করিবার নহে। ভারতের

বুদ্ধির মধ্যে দেখা দিয়াছে একটা নিবঙ্কুশ বিচারশক্তি, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণক্ষমতা, সংস্কাবমুক্ত হইয়া সত্যসিদ্ধান্তে পৌঁছিবাব দৃঢ়তা—মস্তিষ্কের এই কয়টি গুণ পূর্ব্বকালে মুষ্টিমেয় জ্ঞানীব মধ্যে ও সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেব মধ্যে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা হইয়া পড়িয়াছে সাধাবণ হিসাবে বুদ্ধিবৃত্তির অনিবার্য্য অঙ্গ। অনুকরণের যুগে অবশ্য এই সকল ধারায ভারত বেশীদূব অগ্রসর হইতে পাবে নাই, কিন্তু বীজ তখনই বপন করা হইয়াছিল; সেই বীজ ফলে ফুলে কি রকমে মুঞ্জবিত হইয়া উঠিতেছে তাহা দেখিতেছি আজ আমরা। দ্বিতীয়তঃ, এই যুগে আধুনিক ভাব চিন্তা সব আমাদেব প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষাব মধ্যে প্রবেশ লাভ কবিযা আমাদেব সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—তাই কেবল গতানুগতিক সংস্কারেব মাপকাঠিতে আধুনিক ভাব-চিন্তাকে বিচাব না কবিয়া, সম্পূর্ণ নূতন রকমে সেগুলিকে দেখা-শুনা আমাদেব পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। সকলেব শেষে, আমাদের প্রাচীন সম্পদের প্রতিও আমবা দিতে পারিতেছি একটা অভিনব দৃষ্টি এবং ইহারই কল্যাণে আমরা উদ্ধাব কবিতে পাবিতেছি এতদিনকার অন্ধ অথর্ব্ব অনুষ্ঠানাদির মধ্যে গুপ্ত লুপ্ত হইযা ছিল প্রাচীনের যে অর্থ যে প্রাণ; শুধু তাই নয়, এই নূতন দৃষ্টির সহায়েই আমরা প্রাচীন সত্যের ভিতব হইতে খুলিয়া ধরিতে পাবিতেছি নূতন নূতন রূপ, নূতন নূতন অভিব্যঞ্জনা—আমরা আবিষ্কার কবিতেছি নবতর সৃষ্টির, নবতর রূপান্তরের সম্ভাবনা। এই প্রথম যুগে আমাদের প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষাকে আমরা ভুল

বুঝিয়াছি—কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমরা জিনিষকে যে ফিরিয়া নূতন করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি, এমন কি, গোঁড়া প্রাচীনপন্থী মনকেও যে বাধ্য হইয়া এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইয়াছে—ইহাই হইতেছে সকলের চেয়ে বড় কথা।

অনুকবণের যুগের পব প্রতিক্রিয়ার যুগ। এই দ্বিতীয় যুগে ভারত ঘরমুখী হইযাছে, চলিযাছে নিজের জাতীয় সত্তার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার কবিতে করিতে—লাভ করিযাছে ধর্ম্মের ও কর্ম্মেব গভীবতব সত্যতব ইঙ্গিত প্রেরণা সব। প্রথমতঃ, ইংরাজীয়ানাব স্রোতেব মুখে অনতিবিলম্বেই আসিয়া দেখা দিল ভাবতেব প্রাচীন প্রাণ এবং ইহাবই বঙে ক্রমশঃ সে-ইংরাজীয়ানা নিবিড়ভাবে রঙিযা উঠিতে লাগিল। আজিকাল আধুনিক-শিক্ষিত যাঁহাবা এখনও জোর করিযা পাশ্চাত্যেব ভাবে অভিভূত হইয়া আছেন তাঁহাবা সংখ্যায় অতি অল্প এবং দিন দিনই কমিয়া আসিতেছেন। আব ইঁহাবাও, এক সময়ে যে সাধারণ রীতিই একটা হইয়া উঠিযাছিল প্রাচীনকে মুক্তকণ্ঠে তারস্বরে গালাগালি দেওয়া, সেই রকম কিছু কবেন না। আধুনিক-শিক্ষিতদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই ভাব আস্তে আস্তে বদ্‌লাইয়াছে, তাঁহাদের আধুনিকতা ক্রমশঃ ভরিয়া উঠিয়াছে প্রাচীনেব ভাবে, অনুভবে, উত্তবোত্তব তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিযা চলিয়াছেন ভারতীয় জিনিষের যে বিশেষ ধরণধারণ, তাহার অর্থ কি—প্রাচীনের রূপ অপেক্ষা ভাবকে মোটামুটি গ্রহণ করিয়া তাঁহারা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন একটা নূতন ব্যাখ্যা। প্রথম প্রথম আমরা যে অর্থ করিয়াছি,

তাহার মূল কথাটি স্পষ্টই আধুনিক ছাঁচে ঢালা ছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে পাশ্চাত্যের অনুপ্রেরণাই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু আমাদের এই চিন্তাপ্রবাহ স্বেচ্ছায় সাগ্রহে আপনার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়া চলিল প্রাচীনের চিন্তাপ্রবাহ সব এবং ক্রমে ক্রমে প্রাচীনের যে আসল সত্য ভাব তাহার দ্বারাই গাঢ় হইতে গাঢ়তর রঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই অনুরঞ্জনের পথে শেষে আমরা এতদূর চলিয়া গিয়াছি, গোড়ায় যে চিন্তা, যে ভাব দিয়া সুরু করিয়াছি, পরে রঙ্ রেখা বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে তাহা এমন রূপ লইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা ভারতেরই একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। এই রকমে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহার ধাপ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি দুই জনের সৃষ্টি দিয়া—ইদানীন্তন কালের সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে যে দুইজন প্রতিভার বিশেষত্বে ও নূতনত্বে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাশ্চাত্যের সংস্পর্শজনিত এই যে পরিবর্ত্তনের ধারা, তাহার সাথে সাথেই আবার বিপরীত দিক্ হইতে একটি আরও বিশেষ ধরণের বলবত্তর ধারা বহিয়া চলিয়াছে। গোড়ায় এইটির আরম্ভ পূর্ণ বিদ্রোহ দিয়া—ভারতের যাহা কিছু, তাহা ঠিক যেমন আছে তেমনই সে গ্রহণ করিয়াছে, জোর করিয়া সমর্থন করিয়াছে; আর কোন কারণের জন্য নহে, শুধু এই কারণে যে, তাহা ভারতের। এই ধাক্কার জের এখনও আমাদের মধ্যে পাওয়া যায়, এখনও ইহার অনেক প্রভাব সজীবভাবে বর্ত্তিয়া চলিয়াছে;

কারণ, ইহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু এই যে প্রতিক্রিয়া, বাস্তবিকপক্ষে তাহা হইতেছে একটা আরও সূক্ষ্ম সম্মিলনের একীকরণেব আয়োজন। অতীতের জিনিষকে সর্ব্বতোভাবেও সমর্থন করিতে গিয়া আমরা বাধ্য হইয়া দেখিতেছি যে, সে কাজটি এমন ভাবে কবিতে হইবে যাহাতে প্রাচীন ও নবীন মনোভাব, গতানুগতিক সংস্কার ও আধুনিক বিচারবৃত্তি দুইই এক সাথে মিলিতে পাবে,—যুগপৎ পায় চরিতার্থতা। ফলে আমবা কেবল আব অতীতে ফিরিয়া চলিতে পারি না, জ্ঞানে হউক, আর অজ্ঞানে হউক, কার্য্যত আমবা অনতিবিলম্বে অতীতকে নূতনেবই সংজ্ঞায় ব্যক্ত কবিতে থাকি। বস্তুতঃ, পরে এই অতীতের দিকে চলা, এই নিজের ঘরের অভিমুখে যে গতি, তাহার মধ্যে পাই একটা পূর্ণ সমন্বয়েব প্রয়াস। এই যুগে আমরা অতীত শিক্ষাদীক্ষার প্রাণটি চাহিয়াছি বটে, এমন কি, তাহার বাহিরের রূপ সবও অটুট রাখিতে, বাঁচাইয়া তুলিতে যত্নপর হইয়াছি ; তবুও সেই সাথে যাহা একেবারে জীর্ণ শীর্ণ—তাহা ফেলিয়া দিতে বা নূতন কবিয়া গড়িতে কুণ্ঠিত হই নাই,—শুধু তাই নয, নূতন যাহা কিছু দৃষ্টিভঙ্গী পুরাতন অধ্যাত্মদৃষ্টিব অঙ্গীভূত হইয়া যাইতে পারিয়াছে বা তাহার উদারতর গভীরতর পবিণতির পক্ষে সহায় হইয়াছে, তাহাও অবলীলাক্রমে আমবা স্বীকার করিয়াছি। অতীত ও বর্ত্তমানকে এই রকমে মুক্তভাবে মিলাইয়া মিশাইয়া চলা,—নূতন গড়ন দিয়া পুবাতনের রক্ষণ—এই আদর্শের শক্তিমান বিগ্রহ ছিলেন বিবেকানন্দ।

কিন্তু ইহাও শেষ কথা নয়—এখান হইতেই আবার আর একটা নূতন স্থষ্টিব ধারাব সূত্রপাত। অন্যথা, আমবা যে চিন্তাব ও প্রেরণাব যুগলধারাব কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিযাছি, তাহাব ফলে পাইতাম একটা বিসদৃশ মিশ্রণ—শবীবে যেমন আমবা আজকাল ধাবণ কবি ইউরোপীয ভাবতীয পোষাকেব একটা অপরূপ খিচুড়ী, মনেব জগতে কতকটা হইত সেই বকম একটা বস্তু। ভারতকে অখণ্ডভাবে ফিবিযা পাইতে হইবে তাহাব অন্তবাত্মার গভীবতম প্রদেশে যে নৈসর্গিক শক্তি, বর্ত্তমানেব প্রযাস ভবিষ্য-তেব লক্ষ্য সব ধরিয়া দিতে হইবে ঐ অন্তবাত্মাব শক্তিব কাছে—এই শক্তিই জীবনের সকল প্রকাশকে যথাযথ ভাবে মিলাইয়া মিশাইয়া গড়িয়া পিটিযা তুলিবে। এই ধবণেব যে জীবস্তু, যে নিজস্ব স্থষ্টি হইতে পাবে, তাহার বিশেষ একটা নিদর্শন আধু-নিক ভারতের নব চিত্রকলা। এই নিজস্ব স্থষ্টিব ধারা যখন আমাদের জাতীয় জীবনেব প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে, তখনই নিঃসন্দেহে বুঝিব যে, ভাবতেব নবজন্ম পাইয়াছে অখণ্ড অটুট আত্মপ্রতিষ্ঠা।

৩

বর্ত্তমানে যত রকম প্রেরণা যত দিকে স্পষ্টভাবে, অস্পষ্ট-ভাবে খেলিতেছে, সেই বিরাট বিশৃঙ্খলতা ভেদ করিয়া তাহার ভিতব হইতে ভবিষ্যতেব নবস্থষ্টি ঠিক কি রূপ সব গ্রহণ করিবে তাহা নিরূপণ কবিবাব চেষ্টা বিশেষ উপকাবে আসিবে কি না সন্দেহ। বাদ্যযন্ত্রেব সুববাঁধার শব্দ হইতে তবে কি বাগ-রাগিণী বাজান হইবে, তাহা আবিষ্কার কবিবার প্রয়াসও করা যাইতে পাবে। আমাদেব জাতীয় জীবনে বর্ত্তমানে দুই একটা দিকে ছাড়া ভবিষ্য রূপায়ণের স্পষ্ট নির্দ্দেশ কোথাও দেখা দেয় নাই—এমন কি, এই দুই একটা দিকেও যে নির্দ্দেশ পাই, তাহা হইতেছে প্রথম ঈঙ্গিত বা আভাস মাত্র : সেখানেও যতটুকু ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে কবি তদপেক্ষা অনেক বেশীর ভাগই পিছনে অব্যক্ত রহিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মে হউক, আর অধ্যাত্মসাধনায হউক, চিন্তায হউক, অনুভবে হউক, সাহিত্যে হউক, শিল্পকলায় হউক, সামাজিক ক্ষেত্রে হউক, আর রাজনীতির ক্ষেত্রে হউক—সর্ব্বত্রই এই কথা প্রযোজ্য। সর্ব্বত্রই যে জিনিষটি দেখি, তাহা হইতেছে সূচনাব সূত্রপাত—আরম্ভের আরম্ভ।

তবে একটিমাত্র জিনিষ সম্বন্ধে বোধ হয় নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। সেইটি এই যে, অতীতকালের মত ভবিষ্যতেও

ভারতের জীবনে মুখ্য ও মূল সুর হইবে আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা বলিতে আমরা কেবল সূক্ষ্ম তত্ত্বপরায়ণতা অথবা কাজ করিবার অপেক্ষা স্বপ্ন দেখিবার প্রবৃত্তি বুঝিতেছি না। এই অর্থে আধ্যাত্মিকতা কথাটি প্রাচীন ভারত তাহার পূর্ণ সামর্থ্যের গৌরবময় যুগে কখনও গ্রহণ করে নাই—ইউরোপের ও ইউরোপীয় ভাবে প্রভাবান্বিত একদল সমালোচক বিরুদ্ধে যতই কিছু বলুন না কেন—এবং ভবিষ্যতের ভারতও কখন তাহা গ্রহণ করিবে না। ভারতের মানসশক্তির মধ্যে তত্ত্বচিন্তা একটা প্রধান বৃত্তিই হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই, এবং এই ক্ষেত্রে তাহার যে সমস্ত সামর্থ্য ও প্রতিভা তাহা যেন কখন সে না হারায়, ইহাও বাঞ্ছনীয়। তবে ইউরোপ যাহাকে দার্শনিকতত্ত্ব (Metaphysics) বলে অর্থাৎ জর্ম্মণ বা ফরাসী পণ্ডিতের মত চুল-চেরা চিন্তা সব বিনাইয়া বিনাইয়া বলা অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মত স্থূল জগতের কয়েকটিমাত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে সর্ব্বসাধারণ একটা দর্শনের (Philosophy) সূত্র বা নিয়ম নিষ্কাষণের চেষ্টা—এই দুইটির কোনটিই ভারতের তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শনের স্বরূপ নয়। ভারতের দার্শনিক তত্ত্ব মূলতঃ চিরকালই ছিল বুদ্ধির সহায়ে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে গোচর করিবার, নিকটে আনিবার প্রয়াস। অবশ্য শেষাশেষি, এই দার্শনিক তত্ত্বপরায়ণতা জীবনের আয়তন হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু গোড়ায় তাহার প্রকৃতি এ রকমের ছিল না। আদিকালের বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদের সাক্ষাৎজ্ঞানলব্ধ যে তত্ত্ব তাহাতে,

এই জিনিষটি পাই না এবং পরবর্ত্তী কালে যখন দেখা দিল চিন্তাবৃত্তির সজীব সমর্থ নূতন স্থষ্টির একটা যুগ তখনও—যেমন গীতার মধ্যে—সেই উপনিষদেরই মূলসিদ্ধান্ত অটুট রহিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাই। বৌদ্ধদর্শনই সর্ব্বপ্রথম জীবনকে বাস্তবিক সন্দেহেব চোখে দেখিতে আবম্ভ করে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম দার্শনিক সিদ্ধান্ত হিসাবেই জীবনকে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে—সাধনাব, প্রযোগেব ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ দেখি, সে জীবনকেই ধরিযা চলিযাছে, তাহাতে দিতে চাহিযাছে শুধু একটা নূতন রূপ, নূতন অর্থ। বৌদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত সদাচার ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রণালী মানুষেব জীবনযাত্রায একটা তপশ্চর্য্যাব কঠোর সামর্থ্য আনিযা দিযাছিল, সেই সাথেই আবাব মিশাইযা দিয়াছিল একটা প্রীতিব কোমলতর আদর্শ। এই জন্যই সমাজে, রাষ্ট্রে এবং জীবনেব রহস্য ব্যক্ত কবিয়া ধবিতেছে যে সব শিল্পকলা, তাহাতে বৌদ্ধযুগ এতখানি স্থষ্টিক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল। অধ্যাত্মের সত্য নিবিড়ভাবে উপলব্ধি কবা এবং তাহারই সহায়ে জীবনকে সঞ্জীবিত, পুনর্গঠিত কবা—ইহাই হইতেছে ভারতের প্রকৃতির সনাতন বৃত্তি। যখনই আসিয়াছে স্বাস্থ্যেব, সামর্থ্যের মহত্ত্বের যুগ, তখনই ভারত যে এই বৃত্তিটির কাছে ফিবিয়া যাইবে, তাহা অনিবার্য্য।

ভারতের যত আন্দোলন জীবনকে ঢালিয়া গডিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাব প্রত্যেকটির সূত্রপাত হইয়াছে দেখি একটা নূতন অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা দিয়া, প্রায়ই একটা নূতন ধর্ম্ম-প্রচেষ্টা

দিযা। বেশীদূর যাইতে হইবে কেন, এই যে সেদিনকার ইউ-বোপীয ভাবেব আক্রমণ, তাহা ছিল কতখানি তর্কপন্থী, যুক্তি-বাদী. ধর্ম্মভাবেব পক্ষে অপেক্ষা বিপক্ষেই সে চলিযাছে বেশী ; তাহাব আদর্শ, অনুপ্রেবণা ছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউবোপেব ইহসর্ব্বস্ব বহির্ম্মুখী বুদ্ধি , অথচ ভাবতবর্ষেব উপর ইহসর্ব্বস্ব বহির্ম্মুখী বুদ্ধি ; অথচ ভারতবর্ষের উপব তাহার প্রথম ফল হইল ধর্ম্মসংস্কাবেব চেষ্টা, চেষ্টা শুধু কেন, কার্য্যতঃ কযেকটি নূতন ধর্ম্মেবই স্থষ্টি। ভারতের এই বোধ একবকম নৈসর্গিক যে চিন্তাজগৎকে সমাজকে নূতন কবিযা গড়িতে হইলে আগে দবকাব আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা ; ধর্ম্মেরই প্রেবণা ও ধর্ম্মেবই রূপাযণ দিযা তাহা আবম্ভ করিতে হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজেব উদ্ভব একটা উদাব বিশ্বজনীন্ ভাবে ; যে সমন্বয়েব চেষ্টা সে কবিয়াছে, তাহাব জন্য উপকরণাদি সংগ্রহ কবিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও জাতিব ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা হইতে। তাহার মূল অনুপ্রেরণা ছিল বৈদান্তিক, কিন্তু বাহ্য রূপেব জন্য সে গিয়াছিল ইংলণ্ডের Unitarian (একেশ্বরবাদী) সম্প্রদাযের নিকট—এই ধর্ম্ম-মতের কতকটা ধরণধারণ, কতকটা খৃষ্টানী প্রভাব, অনেকখানি যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিসর্ব্বস্বতা প্রভৃতি মিলিযা মিশিয়া হইয়াছে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ; কিন্তু এখানে যাহা লক্ষ্য করিবাব বিষয়, তাহা হইতেছে এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাতই হয় বেদান্তকে ফিবিয়া নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা কবিবার প্রয়াসে। শুধু তাই নয়, দেশের সনাতন শিক্ষাসাধনাব মধ্যে যাহাকে বলা যাইতে পারে প্রতিবাদের ধারা,

তাহাও কি রকমে সমষ্টিগত ধারাবই আকৃতি প্রকৃতি অনুসবণ কবিযা চলিয়াছে সেই রহস্যেরও আছে একটা বিশেষ অর্থ। ভাবতেব ধর্ম্মবৃত্তি চিবন্তন কাল হইতে তিনটি প্রেরণাব উৎসকে ধবিয়া ফুটিয়া উঠিযাছে—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম। ঠিক এই তিনটিকে ধবিযা একেব পব একে ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমে তিনটি ভাগে শাখাযিত হইযা উঠিযাছে। তাবপব পাঞ্জাবে যে আর্য্যসমাজ তাহাব প্রতিষ্ঠা বেদেব এক নূতন ব্যাখ্যাব উপব, তাহাব চেষ্টা হইতেছে বৈদিক সত্য-সকল আধুনিক জগতেব জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ কবা। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ছিলেন যে ধর্ম্মান্দোলনের শীর্ষে তাহা চাহিযাছে অতীত যুগেব সকল ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও অধ্যাত্ম-উপলব্ধিকে একটা বিবাট উদাব মহাসমন্বয়েব বিধৃত কবা—সে সমন্বয প্রাচীন বৈবাগ্য ও সন্ন্যাসকে আবাব সকলেব উপবে স্থাপন কবিযাও তাহাবই সঙ্গে মিশাইযা দিয়াছে নূতন জীবন্ত সাধনার ধারা, জনসেবাব আগ্রহ, দেশে বিদেশে প্রচাবেব উৎসাহ। এমন কি, গোঁড়া যে হিন্দুধর্ম্ম. তাহারও গাযে নূতন জাগরণের হাওয়া লাগিযাছে—যদিও ২৫।৩০ বৎসব পূর্ব্বে সে জিনিষটির যেমন জোব ছিল, আজ ঠিক তেমন নাই। ভাবতেব অন্যান্য অংশও এই সকল বিপুল প্রাদেশিক আন্দোলনেব ঢেউ কিছু কিছু অনুভব করিয়াছে, কোথাও বা নিজেরাই ছোট ছোট আন্দোলন সৃষ্টি কবিয়াছে। বঙ্গদেশে ধর্ম্মভাবেব সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক পরিণতি হইতেছে একটা নব বৈষ্ণবভাবেব প্রসার; তাহাতে প্রমাণ হয়, যে-সব নব সৃষ্টিব প্রযাসের ভিতর দিযা দেশ আপনাকে

তৈযার করিয়া লইতেছে এখনও তাহাদের কাজ শেষ হয় নাই। সমস্ত ভাবতবর্ষ ব্যাপিযাই দেখি যাবতীয় পুরাতন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা সাধন-পথ নূতন প্রাণে সমর্থ সজাগ হইয়া উঠিতেছে, ফিবিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠাব জন্য যত্নপর হইযাছে। ইস্‌লামও কিছুদিন হইল এই সর্ব্বত্রব্যাপী সাড়ায় যোগ দিযাছে, ভারতেব যে মুসলমান জনসাধাবণ দীর্ঘকাল ধবিয়া তামসিকতার ঘোরে নিমজ্জিত ছিল তাহার মধ্যেও চেষ্টা চলিয়াছে, ইস্‌লামের সনাতন আদর্শ আবাব জীবন্ত কবিযা ধরিতে অথবা নূতন নূতন ভাবে আবার ঢালিযা গড়িতে।

পুরাতনেব জন্য এই যে সকল নূতন রূপ আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাব কোনটি তাই বলিয়া কিন্তু পাকা হইয়া উঠে নাই। এ সব প্রয়াসকেই পরীক্ষার পর্য্যাযে ধরিতে হইবে—ভাবতের অধ্যাত্মবোধ কি রকমে আস্তে আস্তে চাবিদিকে হাতড়াইয়া হাতড়াইযা জাগিয়া উঠিতেছে, অতীতেব স্মৃতিকে উদ্ধার করিয়া ভবিষ্যতেব দিকে মুখ ফিবাইয়া দেখিতেছে, তাহারই নিদর্শন হিসাবে। ভাবত হইতেছে সকল ধর্ম্মেব মিলনক্ষেত্র। তাহাদের মধ্যে আবার এক হিন্দুধর্ম্মেরই কি বিশালতা, কি জটিলতা! বস্তুত, হিন্দুধর্ম্ম একটা বিশেষ ধর্ম্ম নয়, তাহা বহুল বিবিধ অথচ অতি-সূক্ষ্ম একটা মিলনসূত্রে গ্রথিত অধ্যাত্মচিন্তার, উপলব্ধির, আদর্শের পুঞ্জ। এত সব ধারার এত রকমারি অনুপ্রেরণার যে চাঞ্চল্য, যে বিপুল হট্টগোল তাহার ভিতর হইতে কি বস্তু যে বাহির হইয়া আসিবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত। তবে যাহা হইয়াছে

দেখিতে পারিতেছি তাহা এই—নূতন কর্ম্মের সৃষ্টির জন্য আমাদের আসিযাছে একটা যথার্থ প্রেবণা, পুরাতন যে সব রূপায়ণ তাহাদেব মধ্যে আসিযাছে একটা নূতন প্রাণ নূতন জীবন, প্রাচীন শিক্ষাব সাধনাব শাস্ত্রেব সিদ্ধান্তেব চলিয়াছে পুনরালোচনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ; দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্দ্দেশ কবা যাইতে পারে, বেদ বেদান্ত পুবাণ যোগ এবং কিছুদিন হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত আমাদের বুদ্ধিকে নাড়া দিতে আবম্ভ কবিয়াছে—যদিও একথা বলা যায় না যে, আমরা সে সকলেব পূর্ণ অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি কবিতে পাবিয়াছি বা বাস্তব জীবনে তাহাদের কিছু প্রযোগ কবিয়াছি,—ব্যবহারিক জগতে আমাদেব চিন্তাব মনোভাবেব উপব তাহাদের বাস্তবিক ফল কিছু হইযাছে। মোটেব উপব দেখিতে পাইতেছি, আমবা যেন সত্যেব বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ক্রমবিকাশেব পথে চলিযাছি, প্রাচীন ভাবের চিন্তাব নূতনতর উপলব্ধি অনুভূতিব ভিতব দিযা নব রূপসৃষ্টির দিকে অগ্রসর হইতেছি। শেষ পবিণতি যাহাই হউক না, নবীন ভাবতেব যে বিশেষত্বটুকু সকল জিনিষেব উপবে আজ ফুটিযা উঠিযাছে, তাহা হইতেছে এই আধ্যাত্মিকতার এই ধর্ম্মভাবেব আলোড়ন বিলোড়ন। এই ক্ষেত্রেই স্পষ্ট দেখা দিয়াছে একটা সৃষ্টিব, নূতন গঠনেব সামর্থ্য ; কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে, অন্ততঃ সে দিন পর্য্যন্ত, ভারত দেখাইয়া আসিয়াছে বেশীর ভাগ ভাঙ্গিবাব বা সমালোচনা করিবার প্রেরণা। আর একটি বিশেষত্ব সকল প্রয়াসেব মধ্যে আস্তে আস্তে জাগিযা উঠিতেছে, সেটি হইতেছে অধ্যাত্মকে জীবনের উপর ফলাইয়া

ধরা। আজ দেশেব নূতন প্রাণ চাহিতেছে, অধ্যাত্মজীবন যেন তাহার ব্যবহাবেব জীবনেবই প্রতিষ্ঠা হইয়া দাঁড়ায। এমন কি, সন্ন্যাস, বৈবাগ্যও দেখিতেছি আব কেবল ধ্যানমগ্ন, আত্ম-সমাহিত বা উদাসীন হইযা থাকিতে পারিতেছে না, প্রচাবেব জন্য, শিক্ষাব জন্য, জনসেবাব, মানবেব কল্যাণ কর্ম্মেব জন্য উৎসুক হইযা পডিযাছে। দেশের যাঁহাবা চিন্তাবীর মনীষী, তাঁহাবা সকলেই এই জীবন-সাধনাব উপবে দিনের পব দিন উত্তবোত্তব বেশী জোব দিযা চলিযাছেন। ভবিষ্যতে আমবা কোন্ দিকে কি কবিব বর্ত্তমানে তাহাব বিশেষ ইঙ্গিত বোধ হয় এইখানেই। ইহাবই মধ্যে হযত বহিযাছে ভাবতেব নবজন্মেব গুপ্ত রহস্য। ভাবত চাহিতেছে তাহাব জীবনপ্রতিষ্ঠানেব যে সব বাহ্যিক রূপ তাহা হইতে আপনাকে সবাইযা লইযা অন্ত-রাত্মাব গভীবতম সত্তাব মধ্যে ডুবিয়া যাইতে এবং সেখানে হইতে একটা অধ্যাত্মশক্তিব মুক্তধাবা লইযা আসিযা, ফিবিযা আবার সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোতভাবে তাহাব দ্বাবায় অভিষিক্ত কবিয়া তুলিতে।

কিন্তু জীবনকে ধবিয়া চালাইবাব জন্য এই অধ্যাত্মশক্তি কোন্ কোন্ মৌলিক চিন্তাসূত্র, কি বকম যন্ত্র বা প্রণালী সব আশ্রয় গ্রহণ কবিবে, তাহা এখনও স্থির কবিযা বলা যাইতেছে না। কাবণ, নবভাবত এখনও বস্তুকে বুদ্ধির মধ্যে সুস্পষ্ট সুসীম কবিয়া ধবিতে পাবে নাই; নানা ধর্ম্মমত, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান সবই তাহাব পিছনের আধ্যাত্মিক প্রেরণাব বাহ্য লক্ষণ মাত্র—ধর্ম্ম-

সাধনা জিনিষটাই এখন হইতেছে আপনার নিভৃত শক্তিকে লাভ করিবার জন্য অধ্যাত্মশক্তির নিবিড় প্রয়াস। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ বা প্রসার হইতে থাকে তখন, যখন সে-আধ্যাত্মিকতা মনের মধ্যে এমন সমর্থ চিন্তা তুলিয়া ধরে যাহার কাজ জীবনে রূপ সৃষ্টি করা, এমন সব আদর্শ ফুটাইয়া তোলে যাহা নূতন নূতন দিকে বুদ্ধিকে নিযুক্ত করে, ফলাইয়া ধরিবার জন্য প্রাণশক্তিকে প্রচালিত করে।

ভারতবর্ষে দর্শনের কাজ ছিল বুদ্ধির সহায়ে বুদ্ধির ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা উপলব্ধিকে প্রকাশ করা। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দার্শনিক বুদ্ধি এখনও কোন নূতন সৃষ্টি সম্যক্ আরম্ভ করিতে পারে নাই। এ যাবৎ ইহা পুরাতন জ্ঞানসম্পদ্‌কেই ফিরিয়া আবার—হয় ত ভিন্ন কথায়—বলিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু জ্ঞানের, আদর্শের পরিধি বাড়াইয়া ধরিবার জন্য কোন নূতন তথ্য স্থাপনের দিকে তেমন অগ্রসর হইতে চাহে নাই। ইউরোপীয় দর্শনের সংস্পর্শও তাহার মধ্যে নবসৃষ্টির ধারা কিছু উৎপাদন করিতে পারে নাই। ইহার অবশ্য কারণ আছে। প্রথমতঃ, দর্শনের ক্ষেত্রে ইউরোপের নিকট হইতে গ্রহণ করিবার মত ভারতের তেমন কিছু আছে কি না সন্দেহ। ইউরোপের দর্শনে পাই যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তথ্য, তাহা দেখি ভারতবর্ষ আগেই আবিষ্কার করিয়া বসিয়া আছে, তাহার নিজের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও প্রতিভার সহিত সামঞ্জস্য থাকে এমন যথাযোগ্য ভাবে ও রূপে। অবশ্য ইদানীন্তনকালে নীট্‌শ, বের্গসন ও জেম্‌স-এর চিন্তা এখানে

ওখানে দুই একটি মনকে স্পর্শ করিয়াছে বলা যাইতে পাবে; কিন্তু তবুও ইহাদের সিদ্ধান্তে স্থূল প্রত্যক্ষ, বাহ্য কর্ম্মফল, মানুষের প্রাণশক্তিকে এতখানি বড় কবিয়া দেখা হইযাছে যে, মনে হয় না ভাবত তাহাকে সত্যতঃ কখন আপনার বস্তু করিয়া লইতে পাবিবে। ভাবতের দর্শন বিকশিত হইযা উঠিতে পারে একমাত্র অধ্যাত্ম-দৃষ্টিকে আশ্রয় কবিযা; গত শতবৎসব ধবিযা যত ধর্ম্মান্দোলন উঠিযাছে, তাহাবা যেসব অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা তুলিয়া ধরিয়াছে, তাহারই ফলস্বরূপ শুধু পাওযা যাইতে পারে ভাবতেব নবদর্শন। ইউরোপের মত, কেবল বিচাব-বিশ্লেষণ-পরাযণ তর্কবুদ্ধি অথবা বৈজ্ঞানিক চিন্তা জ্ঞান কখন ভাবতে দর্শনেব জন্ম দিতে পারিবে না। তা ছাড়া, নূতন সৃষ্টি করিতে পাবে এমন সমর্থ তর্কবুদ্ধিও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে আবির্ভূত হইয়া সে ধবণেব ক্ষেত্র প্রস্তুত কবিয়া যাইতে পাবে নাই। যাঁহাদেরই ছিল নিজস্ব একটা চিন্তাশক্তি, তাঁহারা সে বৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন বিশুদ্ধ সাহিত্যে, কিম্বা ব্যাপৃত বাখিযাছেন আধুনিক ভাব চিন্তা সব আত্মসাৎ করিযা লইতে, বড জোড, ভাবতীয় ছাঁচে ঢালাই করিতে। আজকাল হযত একটা সমর্থতব চিন্তাশক্তির খেলা ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহাব মধ্যে স্থিরত্ব কিছু নাই, তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কিছুই বলা চলে না।

পক্ষান্তবে, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট কিছু যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত এই কয়টি বিষযেও বঙ্গদেশই প্রধানতঃ পথ দেখাইতে

আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গলাই যেন ভারতশক্তির প্রথম পরীক্ষাগাব ; এখানেই নূতন আদর্শ, নূতন আশা, নূতন আকাঙক্ষা সব নূতন রূপের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ঢালাই পেটাই হইতেছে। ভাবতের আব আর প্রদেশে নবস্থষ্টির প্রয়াস অনেক চলিযাছে বটে, এক আধ জন প্রতিভাশালী লেখক বা কবিরও উদ্ভব হইয়াছে শুনা যায় ; কিন্তু একমাত্র বাঙ্গলাই ইতিমধ্যে গডিযা তুলিয়াছে রীতিমত একটা সাহিত্যের রাজ্য—সে সাহিত্যের আছে নিজস্ব প্রাণ, নিজস্ব রূপ, পাকা বনিযাদ তাহার স্থাপিত হইয়াছে ; তাই এখন দিন দিনই তাহা বাড়িযা চলিয়াছে। বাঙ্গলার চিত্রশিল্প আর নগণ্য নয,—একটা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ, একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিব দ্বাবা অনুপ্রাণিত এই বাঙ্গলাব আপনকাব শিল্প বিশ্বশিল্পেব খুলিযা দিযাছে একটা নূতন ধাবা। বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে দুই জনের নাম আমবা সকলেই জানি—তাঁহাদের এক জনেব আবিষ্কার ত একটা 'ওলট্‌পালট্‌' ঘটাইয়াছে ; তা ছাড়া, বাঙ্গলায় যে তরুণ গবেষকমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছে, বিজ্ঞানেব ভাণ্ডাবে তাহাদেব দানও আজকাল হিসাব কবিতে হইতেছে। সুতবাং বঙ্গদেশের দিকে লক্ষ্য কবিলেই আমবা বুঝিতে পাবি, ভাবতেব মতি, ভাবতের গতি ; বিশেষভাবে, বাঙ্গলার চিত্রকলা এ বিষযে আমাদের যতখানি সাহায্য কবিবে, ততখানি আর কিছুতে করিবে না— এমন কি, বঙ্কিমের গদ্যও নয়, ববীন্দ্রের কাব্যও নয়। তার কারণ, বাঙ্গলার কবিতাকে হাতড়াইয়া হাতডাইয়া চলিতে হইয়াছে, এবং এখনও সে যে ঠিক পথটায় পাকাপাকি উঠিতে পাবিয়াছে,

এমন বলা যায় না ; কিন্তু বাঙ্গলাব চিত্রশিল্প প্রথম চেষ্টাতে পা বাড়াইতেই, একটা যেন অপবোক্ষ উপলব্ধিব বলে, একেবারে তাহাব স্বধর্ম্মেব স্বরূপেব পথে গিযা দাঁড়াইয়াছে।

এ বকম যে হইয়াছে তাহার প্রথম হেতু এই যে, বাঙ্গলার নূতন সাহিত্যেব গোড়া-পত্তন হইযাছে বিদেশী প্রভাবেব, একটা অস্পষ্টতার অনিশ্চয়তাব যুগে। ভাবতের শিল্প কিন্তু সে সময়ে নির্ব্বাক নিস্পন্দ ছিল, কোন বকম সাড়াশব্দ দেয় নাই—অবশ্য ববিবর্ম্মাব বীভৎস প্রযাস মাঝখানে কিছু দিন সোবগোল তুলিযা-ছিল; কিন্তু সুন্দবেব নামে সে কুৎসিতের পূজা বন্ধ্যা নারীব গর্ভ-বেদনার মতই যে নিবর্থক, নিস্ফল হইয়া পড়িবে তাহা স্বাভাবিক। ভাবতেব নব শিল্প জন্ম লইল ভারত যখন আপনাকে পাইতে চলিয়াছে, দেখিযাছে একটা স্পষ্টতর জ্ঞানেব আলোক। তা ছাড়া, দ্বিতীয হেতু হইতেছে এই যে, সাহিত্যেব আশ্রয যে বাক্য ও অর্থ তাহাতে যতখানি আছে অবকাশ, তাবল্য, বৈচিত্র্য, তাহার তুলনায চিত্র বা ভাস্কর্য্য যে সব রূপ ও ভাব ধবিযা চলে, তাহাতে আছে বেশী বকম বাঁধাবাঁধি। কিন্তু চিত্র বা ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্র এই রকমে সঙ্কীর্ণ বলিযাই তাহাব আছে একটা স্বাভাবিক নিবিড়তা, তীব্রতা আব সেই জন্যই তাহাদেব মধ্যে সাহিত্যের চেয়ে সহজে পাই স্পষ্ট নিশ্চয নির্দ্দেশ। আব বাঙ্গলার নবীন শিল্পীদিগেব বিশেষত্ব, সমস্ত শক্তি দেখি এইখানে, যে তাঁহারা জিনিষের স্থূল রূপ ও ব্যক্ত অর্থকে ধরিয়া দেখাইতে চাহেন নাই, গোড়া হইতেই তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল জিনিষের

অন্তবাত্মাব অব্যক্ত বহস্যের সন্ধান। বাঙ্গলার শিল্পের উৎস অপবোক্ষ অনুভূতি, এবং যে রূপ সে বচিয়া তুলিয়াছে, তাহা হইতেছে এই অপবোক্ষ অনুভূতিরই নিজস্ব ছন্দ, আমাদের তর্ক-বুদ্ধি স্থূল চক্ষুব প্রমাণে যে আকাব মাপিযা জুকিয়া তৈয়ার করে সে সকলেব সহিত উহাব কোন সম্বন্ধ নাই। এই শিল্প সীমার উপর ভব কবিয়া হেলিযা পড়িযাছে অসীমেব অব্যক্তের দিকে, তাহাবই কিছু ইঙ্গিত আভাস আবিষ্কাবেব জন্য ; বাহিবের জীব-নেব, স্থূল প্রকৃতিব দিকে সে ফিরিযাছে, তাহাব উপবে এমন বেখা, এমন বঙ, এমন ছন্দ, এমন রূপ সব খেলাইযা তুলিতে যেন ফুটিযা উঠে আব এক বকম জীবনেব, জীবনাতীতেব অভি-ব্যঞ্জনা, ভিন্ন এক প্রকৃতিব, স্থূল প্রকৃতি আচ্ছাদিত কবিযা বাখি-য়াছে যে প্রকৃতি তাহাব দৃশ্যাবলী। ভাবতীয শিল্পকলাব ইহাই হইল সনাতন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্মেরই নূতন প্রযোগ, নূতন ধাবা আজ সে দেখাইতেছে। প্রাচীনতব শিল্পে যতখানি ছিল রূপকেব, পৌবাণিক কথাকাহিনীব আধিপত্য, ভাবেব বা তত্ত্বেব বৃহৎ ব্যঞ্জনা, আধুনিক শিল্পে তাহা নাই ; আধুনিক শিল্প দিতে চাহিতেছে আভাসে ইঙ্গিতে অতি সন্তর্পণে একটা নিবিড সাক্ষাৎ সূক্ষ্ম রূপায়ণ। এই শিল্প বাস্তবিকই একটা নূতন সৃষ্টি ; আশা কবা যায, বাঙ্গলা এই যে পথ খুলিযা দিয়াছে, তাহাতে ভাবতেব অন্যান্য প্রদেশ উঠিয়া আসিয়া চলিতে থাকিবে। শুধু তাই নয়, কলিকাতার নূতন শিল্পীমণ্ডলী শিল্পের দিযাছে যে বিশেষ ধরণধারণ, তাহা বাঙ্গলার প্রাণেবই অন্তরঙ্গ বিকাশ ;

সুতরাং অন্যান্য স্থানের নূতন শিল্পী আরও নূতন ধরণধারণে আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন পথ খুলিয়া ধরিতেছেন, এরকমও আমরা অচিরে দেখিতে পারি। কিন্তু ভারতের মহত্ব এইখানে যে, একদিকে তাহার আছে যেমন প্রদেশ-গত শিক্ষাদীক্ষার বিপুল বৈচিত্র্য, তেমনি অন্যদিকে সে সমস্তকে ধরিয়া আছে তাহার একটা নিবিড় অখণ্ড দেশগত ঐক্য। ভারতশিল্পের নব অভ্যুত্থানে ভারতের এই প্রকৃতিটিই যথাযথ প্রতিফলিত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা।

বঙ্গদেশের কাব্য ও সাহিত্য স্পষ্ট দুইটি বাঁক পার হইয়া আসিয়াছে এবং মনে হয় এখন আর একটি অনুসরণ করিবার উপক্রম করিতেছে; কিন্তু এই তৃতীয়টির স্বরূপ যে কি হইবে, তাহা আগে হইতেই ঠিক বলা যাইতেছে না। তাহার আরম্ভ ইউরোপীয় অর্থাৎ বেশীর ভাগই ইংরাজী প্রভাব লইয়া; সেই যুগেই আমদানী হইয়াছে গদ্যের ও পদ্যের নূতন নূতন ছাঁচ, নূতন নূতন সব সাহিত্যিক ভাব, রসায়নের বিধান। তখনকার সৃষ্টিতে ছিল প্রাচুর্য্য, ছিল উৎফুল্লতা; অনেক কবি তখন দেখা দিয়াছেন—শুধু পুরুষ নয়, মেয়েদের মধ্যেও। তাঁহাদের দুইজন বা একজন ছিলেন রীতিমত প্রতিভাবান স্রষ্টা, অন্যান্যের কবিত্বশক্তিও অকিঞ্চিৎকর ছিল না। সৌন্দর্য্যে মহত্বে পরিপূর্ণ অনেক কিছুই রচিত হইয়াছিল। ফলতঃ, বলা যাইতে পারে জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া সরস্বতীর মুক্তধারা তখন বিপুল উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছিল। তখনকার কাজে কেবলই ছিল যে স্থূল অনুকরণের

ছাপ, তাহা নয়। এ কথা সত্য, বিদেশীর প্রভাব সর্ব্বত্রই চক্ষু চাহিবামাত্র নজরে পড়িত, কিন্তু দেশের প্রাণ তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া লইতেছিল, কেবল অবশ হইয়া তাহাব দ্বারা চালিত হইতেছিল না। বাঙ্গলার যে বিশেষ ধাত, তাহাব নিজস্ব যে রসবোধ, তাহারই ছাঁচে সকল বাহিরের প্রভাবকে ফেলিয়া ঢালাই করিয়া সে গড়িয়া তুলিতেছিল আপনাবই অন্তবাত্মাব বাঙময় মূর্ত্তি। তবুও স্বীকাব কবিতে হইবে যে, রূপ হিসাবে যাহাই হউক কিন্তু বস্তু হিসাবে সেখানে যাহা পাই, তাহা দেশেব খাঁটি অন্তবাত্মাব সম্পদ বলিযা মনে হয না, তাই সেখানে অনুভব হয় কেমন একটা শূন্যতা। সাহিত্যেব দেহে,—তাহার ভঙ্গীতে, তাহাব ভাষায দেখি লাগিযা বহিযাছে বাঙ্গলাব কবিতাব জন্ম-সিদ্ধ চিরপবিচিত একটা লালিত্য, একটা সুঠাম কমনীয় গড়ন ; কিন্তু আসল যে জিনিষ, যে পদার্থ এমন সুন্দর পবিচ্ছদে ব্যক্ত করিযা ধরা হইয়াছে তাহাব মূল্য কষিয়া দেখিতে গেলে বিশেষ কিছু পাই না। এ বকম হইতে বাধ্য। স্রষ্টা যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহার স্বষ্টিতে স্বাধীন চিন্তাব, নিজস্ব অনুভূতির আবেগের অপেক্ষা বেশীর ভাগই যখন থাকে অপরেব ভাব ও ভঙ্গী নিজের করিয়া লইবার আয়াস, তখন সে স্বষ্টি সমর্থ সাববান হইতে পারে না, স্রষ্টাব বাস্তব স্বষ্টি স্রষ্টার ভিতবের সামর্থ্যের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু এই যুগও অনেকদিন পার হইয়া গিযাছে। তাহার যে কাজ করিবার তাহা সে করিয়াছে। তাহার সাহিত্যস্বষ্টি

এখন অতীত ইতিহাসেব মধ্যে আপন ন্যায্য স্থান করিযা লইযাছে। এই যুগের স্রষ্টাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন দুই জন। এক জনেব ভিতব দিযা বাঙ্গলাব গদ্য সাহিত্য পাইয়াছে চবম স্ফূর্ত্তি—এক দিকে তাঁহাব চিন্তাব ধাবা যেমন ছিল নূতন সম্পূর্ণ নিজস্ব, অপর দিকে তেমনি ছিলেন তিনি বসজ্ঞ সিদ্ধ রূপকাব। আব একজন যিনি তিনি এই যুগেব শেষ আলোক-বর্ত্তিকা যখন নির্ব্বাণোন্মুখ তখন আসিযা দেখা দিলেন। তিনি কিন্তু সেই শেষের স্ফুলিঙ্গ হইতে আবাব নূতন একটা সুব, কবিত্বেব একটা গভীবতব মূর্চ্ছনা জাগাইযা ধবিলেন, বাঙ্গলাব যে সত্যকাব প্রাণ তাহাকে মূর্ত্ত কবিযা তুলিলেন। বঙ্কিমেব যে কাজ তাহা এখন অতীতেব বস্তু। তাঁহাব কাজ বাঙ্গলাব নবীন মনেব অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিযাছে—বাঙ্গলাব এই নবীন মন তাঁহাবই প্রভাবে যতখানি গড়িয়া উঠিযাছে আব কিছুতে তাহা হয নাই। ববীন্দ্রনাথ এখনও বর্ত্তমানের অনেকখানি ধরিযা চালাইতেছেন—তবুও বর্ত্তমানকে ছাড়াইয়া ভবিষ্যতেব পথও তিনি খুলিযা দিযাছেন বলিযা মনে হয়। বঙ্কিম ও ববীন্দ্রনাথ দেখাইতেছেন দেশ কি রকমে আপনাব অন্তবাত্মাব দিকে ক্রমে ফিরিয়া চলিয়াছে, ভারতেব সনাতন অন্তবাত্মাই কি রকমে আপনাকে নূতন নূতন রূপে ব্যক্ত করিতেছে। দুইজনেই ঊষার বৈতালিক ; তাঁহারা পাইয়াছেন যাহা তাহা অপেক্ষা খুঁজিতেছেন বেশী, যাহা গোচব করিয়া ধরিয়াছেন তাহা অপেক্ষা যাহাব আভাস দিতেছেন তাহা বেশী। বর্ত্তমানে আবাব দেখিতেছি একটা নূতন কিছু গড়িযা

উঠিবাব প্রস্তাবনা চলিয়াছে। একদিকেব প্রয়াস রবীন্দ্রনাথেব প্রভাবকে ধরিযা, তাহাকে বাড়াইয়া, তাহাবই নূতনতব বিকাশেব পথে চলা; অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের বিরোধী ধাবা, তাহা চায় আবও জাতীয় ভাবেব, সম্পূর্ণ এই দেশের মাটির অনুপ্রেরণা। কিন্তু পরিণাম যে ঠিক কি হইবে তাহা এখনও পবিষ্কার দেখা যাইতেছে না। তবুও মোটেব উপব বোধ হইতেছে যেন বাঙ্গলাব সাহিত্যের ধাবাও তাহাব নব্যশিল্পের ধাবা চলিয়াছে যে দিকে সেই দিকেই ঘুবিযা চলিবে—তবে সাহিত্যেব উপকবণ, কথা ও অর্থ, স্পষ্ট বাক্য ও স্ফুট চিন্তা বলিযা সেখানে আমবা আশা করি স্বভাবতই দেখা দিবে প্রকাশেব ধাবায আবও ব্যাপকতা, ভাবেব কল্পনায অধিকতব বৈচিত্র্য। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এখনও পর্য্যন্ত তেমন কোন পবম স্রষ্টা আসিযা আবির্ভূত হন নাই, যাঁহাব বাণীর মধ্যে আমবা এই বকমের একটা স্পষ্ট অব্যর্থ নির্দ্দেশ পাইয়া স্থির হইতে পারি। তবে আশাব কথা, চারিদিকের অনিশ্চযতার মাঝে যে সব কবিকণ্ঠ মন্দ্রিত হইযা উঠিয়াছে, ইতিমধ্যে তাহাতেই আমরা পাইতেছি একটা আভাস, ইঙ্গিত, একটা ভবসা যে, নবীন ভাবতেব হইবে নূতন ধরণেব এক সাহিত্য, তাহাব প্রতিষ্ঠায থাকিবে গভীবতব কল্পনা, অপরোক্ষ অনুভূতি।

মনের জগতে—যত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যেই হউক না কেন—একটা কিছু স্পষ্ট আরম্ভ বা আরম্ভেব সূচনা যে হইযাছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের বাহিরেব জীবনের দিকে যখন

তাকাই, তখন দেখি সেখানে কেবল অনিশ্চয়তা, কেবল বিশৃ-ঙ্খলতা। এই অবস্থাব কারণ বেশীর ভাগ দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থা—সে ব্যবস্থা প্রাচীন ব্যবস্থা নয়,—প্রাচীনের প্রাণ তাহার মধ্য হইতে অনেক দিনই চলিয়া গিয়াছে—আবার কার্য্যতঃ তাহা ভবিষ্যতেব ব্যবস্থারও অনুরূপ হইয়া উঠিতে পারে নাই। একবাব আশা আব একবার নিবাশাব তবঙ্গে তবঙ্গে ক্রমাগতই প্রতিহত হইয়া দেশ যে উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্যেব ঘূর্ণিপাকে বিপর্য্যস্ত হইযা চলিযাছে, সেবকম অবস্থায় নবজন্মেব অনিবার্য্য নির্দ্দেশ দেশেব জীবনে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিতে পারে না। বর্ত্তমানে যেটুকু স্পষ্ট নিশ্চিত তাহা এই যে, বাহ্যিক অনুকরণেব যুগ, যে যুগে ইউরোপেব বাজনীতিক আদর্শ ও উপায়েব অন্ধ অনুসরণ আমরা করিয়াছি সেই প্রথম যুগ কাটিয়া গিযাছে। বিগত বৎসর দশেক ধবিযা যে আন্দোলন হইয়াছে তাহার ধাক্কায় ভারতবাসীব প্রাণে একটা নূতন বাজনীতিক ভাব জাগিয়াছে—সে আন্দোলন একটা উগ্র দেশপ্রেমকে একান্ত করিয়া ধরিয়া চলিযাছে, দেশ ছাড়া আর কোন কথা বলিতে চাহে নাই, দেশ-সেবাকেই তাহা ধর্ম্মসাধনার পদে উন্নীত করিয়া ধরিযাছে, রাজ-নীতিব ক্ষেত্রে ধবিয়া প্রয়োগ কবিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মের দর্শনেব সব সংজ্ঞা, দেশকে মাতারূপে শক্তিরূপে ইষ্ট করিয়া পূজা করিয়াছে, ভাবতের সহজাত আধ্যাত্মিক চিন্তা ও প্রেরণার উপব দৃঢ়প্রতিষ্ঠ কবিতে চাহিয়াছে আধুনিক গণতন্ত্রবাদকে। সে আন্দোলন দেশের আত্মপ্রকাশের কোন সুঠাম রূপায়ণ গড়িয়া

দিতে পারে নাই ; তাহার ধরণধারণ অনেক সময়েই ছিল অতি স্থূল একান্ত অনিশ্চিত ; সমস্ত চেষ্টা সে সংহত করিয়া প্রয়োগ করিয়াছে অতীতের ও বর্ত্তমানেব অবস্থাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে নূতন স্থষ্টির সংগঠনেব কাজ সুচারু-রূপে পরিচালিত করিতে সফল হয় নাই। তবুও এই শৃঙ্খলাহীন প্রয়াস দেশের লোককে সত্য সত্যই জাগাইয়া গিয়াছে, ভাবতেব রাজনীতিক মন ও জীবনকে একটা বিশেষ ধারায় ঘুরাইয়া ধরিয়াছে—ইহাব শেষ ফল আজ আমবা দেখিতে পারি না, দেখিব সেই দিন, যে দিন নিজেব ভাগ্যকে নিজে নিয়ন্ত্রিত কবিবার জন্য ভাবতেব হইবে অবাধ পুরুষকাব ও সামর্থ্য।

ভারতেব সমাজের অবস্থা আরও বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত। চারিদিকের আবহাওয়াব চাপে পুবাতন রূপ সব খসিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে, যে সত্যে যে প্রাণে তাহারা সঞ্জীবিত ছিল তাহা ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে অথচ বাহিরের কাঠামটি কোন বকমে টিঁকিয়া চলিয়াছে। লোকে বহুদিনের অভ্যাসকে ছাড়িতে পারিতেছে না, গতানুগতিক চিন্তার ও প্রেরণার বশে জড়েব মত পুবাতনের খাত অনুসরণ করিতেছে ; অথচ নূতনেব জন্মগ্রহণ করিবাব মত পরিণতি ও সামর্থ্য এখনও হয় নাই। ভাঙ্গন চলিয়াছে বটে অনেক দিকে, কিন্তু তাহা এত ধীবে ধীরে যে এক রকম লক্ষ্যই করা যায় না। অতীত একটা নিথব জগদ্দল পাথবের মত শক্ত অসাড় হইয়া পড়িয়া বহিয়াছে—তাহার মধ্যে নূতন গঠনের কোন অবকাশের সম্ভাবনা এখনও পর্য্যন্ত দেখা যায়

না। সমাজসংস্কাব লইয়া খুব সোরগোল হইয়াছে বটে। কত জন ইউবোপীয় সমাজের নমুনা ও আদর্শ দেশের সম্মুখে ধবিযাছেন, অনেকে আবার পুরাতন কালেরই বিধিব্যবস্থা চবম সুন্দব বলিযা ঘোষণা করিযাছেন। কিন্তু ফলে সর্ব্বত্রই হইযাছে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিযা। কারণ এরকম ভাসা ভাসা আন্দোলনে অভাব দৃঢ় নিষ্ঠা, সাধাবণ লোকের উপব সে সকল কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে নাই, তাহাদের যে প্রাণের সত্য তাহাকে স্পর্শও কবিতে পারে নাই। সমাজসংস্কাব যখন ধর্ম্ম-প্রেবণাব সহিত সংযুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যেমন ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি কয়েকটি নূতন সমাজে—তখনই শুধু দেখি একটা স্থাযী সমর্থ কিছু কাজ হইযাছে। এই সাথে সাথে আবাব দেখি গোঁড়া হিন্দুসমাজও আপনাকে বাঁচাইযা বর্ত্তাইযা রাখিবার জন্য চঞ্চল হইযা উঠিযাছে। বলা বাহুল্য, এ আন্দোলনেরও পিছনে গভীর কোন প্রেবণা নাই—সেখানে আছে বুদ্ধিব খোস-খেযাল আর না হয হৃদয়াবেগের বিলাস—যে সব সত্য যে সব শক্তি বাস্তবকে আজ ধবিয়া গড়িতেছে, তাহাদেব ছায়া পর্য্যন্ত উহার মধ্যে পাই না। তবে আস্তে আস্তে দেশবাসীব চেতনায এই কথা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে আমাদেব সামাজিক নীতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সব নূতন কবিয়া ঢালিযা সাজাইতে হইবেই হইবে এবং সেই জন্য দেশকে নিজেব অন্তবের সত্যে প্রবুদ্ধ হইতে হইবে,—যে সব সত্য তাহারই নিজের শিক্ষাদীক্ষাব অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত সে সকল রহিয়াছে গভীরতর স্তরে, অব্যক্ত

অবস্থায, কেবল সামর্থ্যেব ও সুবিধাব অভাবে তাহাদিগকে সে জাগ্রতে ফুটাইযা তুলিতে পাবিতেছে না। বোধ হয়, ভাবতের জাতীয় জীবনে যখন আসিবে আবও মুক্ত একটা অবস্থা, তখনই তাহাব নবজন্মেব পূর্ণতব শক্তি লোকেব সামাজিক মন ও কর্ম্মের উপর জাগ্রত প্রভাব বিস্তাব কবিতে পাবিবে।

৪

ভারতে এই যে নবজন্মের আয়োজন চলিতেছে কিন্তু উদ-যাপন এখনও হয় নাই, তাহাকে যদি সার্থকনামা হইতে হয়, যদি তাহার অর্থ হয় একটা নূতন শক্তিমান দেহে ভারতের অন্ত-রাত্মার পুনর্জন্ম, ভারতের স্বভাবজ সনাতন ধর্ম্মের—'প্রজ্ঞা পুরাণী'র—নূতন রূপায়ণ, তবে তাহাকে দ্বিধাশূন্য হইয়া আরও স্পষ্টতর, পূর্ণতরভাবে জোর দিতে হইবে তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণাটির উপর ; আরও নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে সেই আধ্যাত্মিক প্রেরণাই আমাদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে থাকে। কার্য্যতঃ কিন্তু দেখি, ঠিক এই কথাটি এখনও অনেকে ভুল বুঝিয়া থাকেন বা বুঝিতে মোটেও চাহেন না। অবশ্য তাঁহাদের এ রকম মনো-ভাবের হেতু যে নাই, তাহা নহে। আমাদের দেশে দুই একটি যুগে কালধর্ম্ম অনুসারে সন্ন্যাসবাদ ও ধার্ম্মিকতাকে এতখানি আতিশয্যের মাত্রায় টানিয়া লওয়া হইয়াছিল, এক সময়ে আমরা এতখানি পরলোকসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম যে তাহারই প্রতি-ক্রিয়ায় আমাদের মধ্যে জন্মিয়াছে, জোর পাইয়াছে এই অবি-শ্বাসের অনাস্থার ধারা। কিন্তু তবুও বলিব এই হেতুবাদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে একটা ফাঁক—ইহার দ্বারা যাহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা হয়, তাহা প্রমাণিত হয় না। আমাদিগকে

সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, সাহিত্যে, শিল্পে বা রাজনীতি ও সামাজিক জীবনে আধ্যাত্মিকতা বলিতে আমরা কি ছাই বুঝি—যদিও ভারতের সমস্ত অতীতের শিক্ষাদীক্ষার কথা মনে করিলে ভারতবাসীরই মুখে আজ আবার এ রকম প্রশ্ন শুনিয়া কিছু স্তম্ভিতই হইতে হয়। আমাদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় কাব্যে বা কলায় একটু আধ্যাত্মিকতার জল ছিটাইয়া দিলে তাহাদের এমন কি গৌরব বাড়িয়া যায়? এই হাওয়ার জিনিষ-টিকে দিয়া সমাজের বা রাষ্ট্রের যে সমস্ত স্থূল সমস্যা সেগুলির কোন্ সুরাহা হইবে? বাস্তবিক পক্ষে এই যে সব আপত্তি, তাহা ইউরোপের একটা ধারণার প্রতিধ্বনি মাত্র। ইউরোপে অনেক দিন ধরিয়া একটা সংস্কারের মত হইয়া গিয়াছে যে ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা হইতেছে এক দিকে, আর এক দিকে যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান, বাস্তব জীবন—এই দুইটি ধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের, তাহাদের প্রত্যেককে অনুসরণ করিতে হইবে আলাদা আলাদা পথ, প্রত্যেকের রহিয়াছে নিজের নিজের পৃথক্ ধরণ-ধারণ, নিয়ম-কানুন। এই সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে আরও একটি সন্দেহ করা হয় যে, আধ্যাত্মিকতার নামে হয়ত বা আমরা বাস্তব হইতে কর্ম্ম-জীবন হইতে ফিরাইয়া লইয়া ভারতকে দিতে চাহিতেছি একটা ভাবুকতার, ধ্যানপরতার আদর্শ। ভারতকে আজ শক্তিমান্ কর্ম্মঠ সংহত 'নেশন' হইয়া উঠিতে হইবে,—বর্ত্তমান জগতের সঙ্ঘর্ষের মধ্যে বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে বিচার-বুদ্ধির আধুনিকতার পথেই অগ্রসর হইতে হইবে; কিন্তু

তৎপরিবর্ত্তে আমরা কি পুরাকালের পুরাতন ধর্ম্মান্ধতাকে ডাকিয়া আনিতেছি না, যুক্তিহীন কুসংস্কারপূর্ণ সব শিক্ষা দিয়া ভারতকে আবার অজ্ঞানের যুগে টানিয়া লইতেছি না? কথাটা তাহা হইলে আরও পরিষ্কার করিয়া আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব—আধ্যাত্মিকতাকে ধরিয়া ভারতের নবজীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে, আমাদের এই সূত্রটির প্রকৃত অর্থ কি।

কিন্তু আগে আমাদের সূত্রটির অর্থ কি যে নয়, সেই কথাটাই বলিব। বলা বাহুল্য, সূত্রটি এমন শিক্ষা দেয় না যে, জাগতিক জীবনকে একটা ক্ষণিকের মোহ রূপে মনে করিতে হইবে, যত সত্বর সম্ভব আমাদের সকলকেই মুনি সন্ন্যাসী হইয়া পড়িতে হইবে, মঠের, গিরিগুহার, পর্ব্বতশিখরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সামাজিক জীবনের সমস্ত বিধিব্যবস্থা বাঁধিতে হইবে, মানব-জাতির সমবেত উন্নতি, অথবা ইহলোকের সংস্পর্শে আসে, এমন কোন কিছু লক্ষ্য সামাজিক জীবনের থাকিতে পারিবে না, জীবনের আদর্শ হইবে স্থির নিশ্চল স্থাণুত্বলাভ করা। এই ধরণের প্রেরণা ভারতের মনে এক সময় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই—কিন্তু তাই বলিয়া ইহা ছাড়া আর কোন প্রেরণা ভারতের যে ছিল না, তাহা নয়। তারপর, আধ্যাত্মিকতা বলিতে এমন বুঝায় না যে, কোন একটা বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে সব সঙ্কীর্ণ সিদ্ধান্ত, বিধান, অনুষ্ঠান, তাহারই ছাঁচে ফেলিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে একটা সমগ্র জাতীয় সত্তা। এই প্রয়াস পূর্ব্বকালে অনেক-বার হইয়াছে বটে, এবং বর্ত্তমানেও পুরাতন সংস্কার যেখানে

যেখানে নির্ম্মূল হইতে পারে নাই, সেখানে সেখানে চলিতেছে। কিন্তু যে দেশ এত বিভিন্ন বিরুদ্ধ ধর্ম্মমতে পরিপূর্ণ, যাহাব মধ্যে আশ্রয পাইযাছে পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্ম্মেব ধাবা এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই যেখানে নূতন নূতন শাখা উপশাখা সব জন্মগ্রহণ কবিতেছে, সেই দেশে অন্ততঃ এই ধবণেব কোন চেষ্টা সঙ্গতও নয়, সম্ভবও নয। একটা বিশেষ ধর্ম্মমত অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতা অনেক বৃহত্তব জিনিষ। আব আধ্যাত্মিকতা যে নূতন একটা ব্যাপকতব অর্থ লইযা জগতে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাব মধ্যে অতি উদাবতম ধর্ম্মমতও হইয়া পড়িবে একটা ধাবা, একটা অঙ্গমাত্র। সেই আধ্যাত্মিকতা হইতেছে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহাব প্রেরণায মানুষ খুঁজিতেছে শাশ্বতকে, দিব্যকে, বৃহত্তব সত্তাকে, একত্বেব উৎসকে : চেষ্টা করিতেছে যাহাতে লৌকিক জীবনেব সহিত লোকাতীত জীবনের স্থাপিত হয একটা নিকট সম্বন্ধ, সহজ সামঞ্জস্য, সম্মিলন।

আধ্যাত্মিকতা বলিতে আমবা যে কোন রকম জিনিষ কিছু বাদ দিযা বাখিতে চাহি, তাহা নয। মানবজীবনে যাহা কিছু মহৎ আদর্শ, আধুনিক জগতে যাহা কিছু বৃহৎ সমস্যা, মানুষেব যে কোন প্রকারেব ঊর্দ্ধমুখী প্রযাস, মানুষের অন্তবাত্মা যে কোন নিবিড় প্রেরণা বা বিশেষ উপাযকে ধবিযা চাহিতেছে বিকাশ, উন্নতি, প্রসারতা, শক্তি, সামর্থ্য, আনন্দ, জ্যোতিঃ, পরিপূর্ণতা —সকলই, সমস্তই আমাদের লক্ষ্যেব অন্তর্ভুক্ত। দেহ নাই যাহার, মন নাই যাহাব সেই আত্মা বা পুরুষ আর যাহাই হউক,

মানুষ নয়। সুতরাং মানুষেব যে আধ্যাত্মিকতা তাহা দেহ প্রাণ মনকে যেন হীন অকিঞ্চিৎকব বলিযা বিবেচনা না করে। বরং এই সমস্তকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিশেষ মূল্যবান বলিয়াই ধরিতে হইবে—কারণ, এই সকলের ভিতর দিয়া, এই সকলকে যন্ত্র করিয়া তবে মানুষের অধ্যাত্মজীবন লীলায়িত হইয়া উঠে। ভারতেব যে প্রাচীন দীক্ষা, তাহা পূর্ব্বতন গ্রীক বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তেব মতনই—তবে ভিন্ন লক্ষ্যে ও মহত্তর উদ্দেশ্যে—জোব দিয়া আসিযাছে দেহ, প্রাণ ও মনের স্বাস্থ্য শক্তি উন্নতির উপরে। তাই যাহা কিছু দিয়া এই অঙ্গ কয়টিব পূর্ণতা সাধন হইতে পারে, তাহারই অবাধ অনুশীলনের পথ সে করিয়া দিয়াছে। মস্তিষ্কেব চর্চ্চা, দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা, বসবোধের তৃপ্তি, ছোট বড় সকল রকম শিল্পকলা, শরীরের স্বাস্থ্য ও বল, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সমগ্র জাতিটিরই সমৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা, পারিপাট্য, তাহার ক্ষাত্রশক্তি, রাষ্ট্রীয় শক্তি, সামাজিক শক্তি—সকল দিকেই ভারত সমান মনোযোগ দিযা আসিয়াছে। আজকাল যেমন আমাদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হয়, সে রকম কোন দিনই ভারত দারিদ্র্যকে একটা জাতীয় আদর্শ বা সাধনারূপে গ্রহণ করে নাই, কোন দিনই এমন বিধান সে দেয় নাই যে নগ্নতা শ্রীহীনতাই হইতেছে আধ্যাত্মিকতার একমাত্র অঙ্গরাগ। প্রাচীন ভারতের লক্ষ্য ছিল উর্দ্ধে, কিন্তু নীচের প্রতিষ্ঠাকেও সে দৃঢ় ও বিস্তৃত করিয়া গড়িয়া দিয়াছিল, এবং যেসকল যন্ত্রপাতি উপকরণ দিয়া গোড়ার বাঁধ, সেগুলির উপরও

বিশেষ যত্নই সে দিয়া আসিয়াছে। নবীন ভারতকেও এই সাধ-নাই করিতে হইবে, তবে নূতন নূতন পথে, নবতব বৃহত্তর সব ভাবের প্রেরণায়; আর তাহাব যন্ত্রাদিকেও আধুনিক জগতের যে জটিলতা তদনুরূপ করিয়া ঢালিতে হইবে। শুধু তাই নয়, তাহার কর্ম্মের প্রয়াসের প্রসারতা, তাহাব মনোবৃত্তির বৈচিত্র্য প্রাচীন ভাবতের অপেক্ষা অল্পতর হইবে না, ববং আবও বিপুল-তর হইযাই দেখা দিবে। আধ্যাত্মিকতাকে কেবল 'নেতি নেতি' হইতেই হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই; তাহার মধ্যে আবার সকল জিনিষই স্থান পাইতে পাবে—আর এইটিই আধ্যাত্মিকতাব পূর্ণ রূপ।

তবুও বলিতে হইবে যে জগৎকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা আর শুধু জড়ের স্তব বা মনেব স্তব হইতে দেখা এক জিনিষ নয়—উভযের মধ্যে আছে বিপুল পার্থক্য। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমবা দেখি দেহ প্রাণ আর মন মানুষেব লক্ষ্য নয, উপায় মাত্র; আর উপাযের মধ্যেও তাহা শ্রেষ্ঠ বা চরম নয়; দেহ প্রাণ মন লইয়া হইতেছে আধারেব অতি বাহিরকাব যন্ত্র, মানুষের সমস্ত সত্তা ইহারই মধ্যে নিঃশেষ হয় নাই। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দেখাইয়া দেয় যে সকল সসীম জিনিষের পিছনে বহিয়াছে অসীম, এই অসীমের কষ্টিপাথরেই ধরিয়া সে নিরূপণ করে সব সসীমের মূল্য। অসীমের অসম্পূর্ণ খণ্ড খণ্ড রূপায়ণ হইতেছে সসীম, সসীমের নিত্য প্রয়াস অসীমকে আবও যথাযথ প্রকাশ করিয়া ধরিতে। মানুষের জগতের পশ্চাতে, ব্যক্ত বাস্তব অপেক্ষা

রহিয়াছে যে একটা মহত্তব বাস্তব, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কেবল তাহাই উদ্‌ঘাটন কবিতেছে না ; কিন্তু মানুষের, জগতেব অন্তরে, অন্ত-বাত্মার মধ্যে সে দেখিতেছে পুরুষকে, এই পুরুষকেই সকলের উপবে সে আসন দিযাছে, মানুষের আর সকল অঙ্গকে নির্দ্দেশ দিতেছে যে প্রকাবে হউক না কেন এই দিব্য সত্তাকে প্রকাশ কবিয়া মূর্ত্ত কবিযা ধবিতে। এই আত্মা, এই পুরুষ, এই দিব্য-সত্তাকেই যেন মানুষ জগতে সকল বাহ্যরূপেব অন্তবালে প্রতিনিযত দেখিতে শুনিতে চেষ্টা করে, নিজের জীবন মন যেন ইহারই সহিত একীভূত কবিযা ধবে, ইহাবই মধ্যে যেন সকল মানুষেব সহিত একত্ব অনুভব কবে। ফলে, আমাদেব সাধাবণ নিত্য-নৈমিত্তিক দৃষ্টিকে যে অনেকখানি বদলাইযাই ধবিতে হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। মানবজীবনেব সকল লক্ষ্যকেই ধরিয়া রাখিলেও, তাহাদেব দিতে হইবে নূতন একটা অর্থ, নূতন একটা সার্থকতা।

আমরা চাহি দেহেব স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য কিন্তু—কোন্ উদ্দেশ্যে ? বলা যাইতে পাবে, স্বাস্থ্য ও সামর্থ্যেব জন্যই জিনিষটা স্পৃহণীয, তাই। অথবা বলা যাইতে পাবে, দীর্ঘজীবনের জন্য, মনে প্রাণে চিত্তে যাহাতে সম্যক ভোগ করিতে পারি, তাহার একটা পাকা বনিয়াদের জন্য। নিরাময় সবল দেহের জন্যই চাই নিরাময় সবল দেহ—এ কথা এক হিসাবে সত্য ; এই হিসাবে যে দেহও হইতেছে আত্মার প্রকাশ, দেহেরও চাই পরিপূর্ণতা, মানুষের যে অখণ্ড জীবনযাত্রা তাহারই অন্তর্ভুক্ত দেহের সার্থকতা।

তা ছাড়া, আরও সত্য হইতেছে এই কথা যে, দেহকে প্রতিষ্ঠা করিয়াই উর্দ্ধে উঠিযা চলিতে হয় মানুষেব মধ্যে দিব্য পুরুষের অনুসন্ধানে—সেই জন্যই ত বলা হইযাছে, 'শরীরং খলু ধর্ম্ম-সাধনং', ধর্ম্মেব সাধনা করিতে হইলে অর্থাৎ যে অন্তরাত্মার সত্য-বিধান লইযা চলে ভগবৎসমীপে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শরীরকেও একটা উপায বলিযা গ্রহণ কবিতে হইবে। সাধারণ বুদ্ধিতে বলা হয় যে মনকে প্রাণকে চিত্তকে উন্নত পরিপুষ্ট কবিয়া তোলা দবকাব, কাবণ, তাহাতে মানুষ অধিকতব আনন্দেব অধিকারী হয, মানুষ তাহাতে পায আপনাব শুদ্ধতব প্রকৃতিবই পরিতৃপ্তি, তাহাতেই সে জীবনেব সার্থকতা অনুভব করে। এ কথা সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আমবা বলিব যে, মন প্রাণ চিত্তও হইতেছে আত্মাবই প্রকাশ, মানুষের মধ্যে ইহাবা খুঁজিতেছে আপন আপন দিব্য রূপাযণ, ইহাদের শুদ্ধি স্ফূর্ত্তি শক্তি সিদ্ধির ভিতব দিযা মানুষ জগতেব মধ্যে প্রকট যে দিব্য-সত্য, তাহার অনুসন্ধান পায, তাহাকে বহুল বিচিত্র ভাবে অধিগত করে, তাহারই ছন্দে পরিশেষে নিজেব সমস্ত জীবনকে মিলাইযা মিশাইয়া ধরিতে পাবে। নীতি বা সদাচার বলিতে সাধাবণতঃ বুঝায ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনেব এমন শৃঙ্খলিত কর্ম্মধারা, যাহার কল্যাণে সমাজ বাঁচিযা বর্ত্তিযা থাকে ; সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির আদানপ্রদান নিযন্ত্রিত হয একটা ন্যায়ের, দরদেব, আত্মসংযমের ও আত্মোৎসর্গেব বিধান অনুসাবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থে নীতি হইতেছে কর্ম্মের মধ্যে, কর্ম্ম অপেক্ষাও বিশেষভাবে

স্বভাবের মধ্যে আমাদের অন্তরস্থ দিব্য পুরুষকে ফুটাইয়া তুলিবার একটা উপায়, ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়া চলিবার পথে একটা সোপান।

আমাদের অন্যান্য লক্ষ্য, অন্যান্য কর্মৈষণা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আধ্যাত্মিকতা সে-সকলগুলিকেই বরণ করিয়া লইতেছে, কিন্তু প্রত্যেকেরই দিতেছে একটা বৃহত্তর, গভীরতর, নিবিড়তর দিব্যভাবের অর্থ। পাশ্চাত্যের ধরণ দিয়া বিচার করিতে গেলে, দর্শন হইতেছে বিশুদ্ধ যুক্তির সহায়ে সৃষ্টির মূল-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা বা গবেষণা। এই সব মূলতত্ত্ব আমরা আবিষ্কার করিতে পারি, এক, জড়বিজ্ঞান আমাদের দুয়ারে আনিয়া দিতেছে যে সব বাস্তব সত্য, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আর না হয়, যুক্তির যে সব মূল বৃত্তি, মস্তিষ্কের যে সব ধারণা, তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া, অথবা যুগপৎ এই দুই পন্থার আশ্রয় লইয়া। কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়া ধরিতে গেলে, আমরা দেখি যে সৃষ্টির সত্য কেবল যুক্তির সহায়ে কি বৈজ্ঞানিক পর্য্য-বেক্ষণের সহায়ে পাওয়া যায় না, তাহা পাওয়া যায় অপরোক্ষ অনুভূতির, অন্তরের উপলব্ধির দ্বারা। দর্শনের কাজ হইতেছে যত রকম উপায়ে যত রকম জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া ধরা এবং শেষে সেই সকল জ্ঞান একটা সমন্বয়ের সূত্রে পরম সত্যের সহিত—একম্ অদ্বিতীয়ম্ যে বিশ্বজনীন বস্তু তাহার সহিত—মিলাইয়া ধরা। ফলতঃ, দর্শনের মূল্য ও সার্থকতা ততখানিই, যতখানি তাহা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা

গড়িয়া দিতে পারে, যতখানি তাহা মানুষকে মানবীয় সত্তা হইতে দিব্য ভাগবত স্বরূপে তুলিয়া ধরিতে সাহায্য করে। এইভাবে বিজ্ঞানও তাহার জগতের জ্ঞান লইয়া বিশ্বের মধ্যে বিশ্বের অধিষ্ঠাতৃ পুরুষেরই কর্ম্মধারাকে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরে। বিজ্ঞান অর্থ যে শুধু স্থূলের জ্ঞান, স্থূলজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ অথবা জড় ও জড়শক্তিকে ধরিয়া জীবনীশক্তির, মানুষের, মনের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যাই হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আধ্যাত্মিক শিক্ষাদীক্ষা বিজ্ঞানের পরিধিকে আরও বাড়াইয়া দিবে, গবেষণার জন্য নূতন নূতন ক্ষেত্র খুলিয়া ধরিবে। প্রাচীনকালে ছিল যে এক সূক্ষ্ম জগতের বিজ্ঞান, যে সব বিজ্ঞান অন্তরাত্মাকে পুরুষকে মূল সত্যরূপে ধরিয়া চলিত; মনের, এমন কি মনের উপরে রহিয়াছে যে বৃহত্তর শক্তি, তাহাকে নামাইয়া কার্য্যকরী করিয়া তুলিত জীবনগতির মধ্যে, স্থূল বস্তুর আয়তনে—সেই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানেরও পুরাতন ও নূতন নূতন রূপ বিজ্ঞান-আলোচনারই অঙ্গ হইয়া উঠিবে। তারপর শিল্পকলা ও কাব্যের গোড়াকার স্থূলতর প্রাকৃত লক্ষ্য হইতেছে মানুষের ও প্রকৃতির প্রতিরূপ সৃষ্টি করা, যাহাতে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ তৃপ্ত হয়, যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির এবং কল্পনার ভাবরাশি সুচারুরূপে আমাদের সম্মুখে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু শিল্পকলা, কাব্য যখন হয় অধ্যাত্ম-দৃষ্টির সৃষ্টি, তখন তাহার লক্ষ্য মানুষের ভিতরে লুক্কায়িত আছে যে মহত্তর পদার্থ সব তাহা ব্যক্ত করিয়া ধরা; যে অধ্যাত্ম রসায়ন, যে বিশ্বসৌন্দর্য্য জগৎ বেড়িয়া আছে তাহাকে প্রকাশ করা।

মানবজীবনের গোড়াপত্তনের দিক দিয়া দেখিলে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি হইতেছে মানুষ যাহাতে সমবেতভাবে বাঁচিয়া থাকিতে, ধনজন উৎপাদন করিতে, বাসনা চরিতার্থ করিতে ভোগ করিতে পারে, যাহাতে দেহপ্রাণমনকে কর্ম্মপটু সমর্থ করিয়া ধরিতে পারে তাহারই একটা ব্যবস্থা। কিন্তু আধ্যাত্মিক দীক্ষা এই সকল প্রতিষ্ঠানের আনিয়া দিবে আরও নূতনতর সার্থকতা। প্রথমতঃ, ইহারা হইয়া উঠিবে জীবনের সাধনক্ষেত্র অর্থাৎ এখানে থাকিয়া মানুষের জাগিবে নিজের সত্যস্বরূপকে দেবত্বকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা, পাইবার প্রয়াস। দ্বিতীয়তঃ, ভাগবতসত্তার যে ধর্ম্ম, তাহাকে জীবনলীলার মধ্যে উত্তরোত্তর ফুটাইয়া ধরিতে থাকিবে ইহারা। তৃতীয়তঃ, এই সব আয়তনকে ধরিয়া মানুষ সমবেতভাবে উঠিয়া চলিবে জ্যোতির, শক্তির, শান্তির, একত্বের, সম্মিলনের দিকে ; মানবজাতি অন্তরে চাহিতেছে যে দিব্য প্রকৃতি, তাহারই মধ্যে। আধ্যাত্মিক শিক্ষাদীক্ষা, জীবনে অধ্যাত্মের প্রয়োগ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা হইতেছে এই, ইহা অপেক্ষা বেশী আর কিছু নয়, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কমও নয়, এইটুকুর মধ্যে আছে যত সম্ভাবনা তৎসমস্তই।

এই আদর্শে যাঁহাদের আস্থা নাই অথবা যাঁহারা ইহা বুঝিতেই পারেন না, তাঁহারা এখনও পাশ্চাত্যসুলভ জীবনকল্পনায় বিমূঢ় হইয়া আছেন। পাশ্চাত্যের বন্যা ভারতের নিজস্ব ভাবকে এক সময়ে যে ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাঁহারা আজও সেই স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ইউরোপ ইতিমধ্যে নিজেই তাহাব পবিচিত গতানুগতিক সংস্কাবকে ছাড়াইযা উঠিবাব চেষ্টা করিতেছে এবং সেই জন্য ঠিক প্রাচ্যেরই দ্বাবস্থ হইতেছে। আমবা দেখিতেছি না কি, প্রাচ্যের আদর্শ প্রভৃতি—অবশ্য বাহ্যরূপ নয়, কিন্তু ভিতরের আসল ভাব বস্তু—কি বকমে আস্তে আস্তে ইউরোপেব মধ্যে প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে? পাশ্চাত্ত্যেব চিন্তা, কাব্য, শিল্পকলা, ব্যবহারনীতি সবই প্রাচ্যেব বঙে বঙীন্ হইযা উঠিতেছে? পাশ্চাত্ত্যের উপব এই প্রাচ্যেব বন্যা তাই বলিয়া পাশ্চাত্ত্যের নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষাকে ভাঙ্গিযা ভাসাইযা দিতেছে না, কিন্তু তাহাকে নূতন কবিযা, বৃহৎ কবিযা গড়িয়া তুলিতেছে। ইউরোপ যখন এইভাবে নূতন সত্যেব আলোকে নিজেকে গবীয়ান্ কবিয়া ধবিবাব চেষ্টা কবিতেছে, অধ্যাত্মেব তত্ত্ব সব ধীরে ধীরে স্বীকার কবিয়া মানুষেব ভিতবে বাহিবে একটা রূপান্তরেব সাধনা করিতেছে, ঠিক সেই সময়ে আমরা ভারতবাসী কি ইউবোপের পবিত্যক্ত জীর্ণবাস বরণ কবিয়া লইব, যে পথ চলিযা সে ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই পথেই চলিতে থাকিব, চিবকালই কাল যাহা সে ফেলিযা দিযাছে, আজ তাহা আমবা আদবে ঘরে তুলিযা লইতে থাকিব? ইউরোপ যে মুহূর্ত্তে আমাদেব উপর আসিযা পডিল তখন ঘটনাচক্রে আমাদেব অবসাদের, দুর্ব্বলতাব অবস্থা—এ বকম অবস্থা সকল উন্নত জাতির ভাগ্যেই একদিন না একদিন আসিযা থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া, আমরা যেন আমাদের শিক্ষাদীক্ষার স্বাতন্ত্র্যে আস্থা না হারাইযা বসি।

এইঘটনায় এমন কিছু প্রমাণ হয় না যে, আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের সাধনা, আমাদেব আদর্শ সব ভুল,—সুতরাং আমাদের উচিত যেন-তেন প্রকারে আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে ইউরোপের নাস্তিকতার, জড়বাদেব ছাঁচে ঢালাই করিয়া ফেলা, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মসাধনা প্রভৃতি যাহা কিছু ভারতের ভারতত্ব, তাহা যৎসামান্যভাবে পিছনে কোথাও শোভারূপে বসাইয়া রাখিলেই যথেষ্ট! বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধ ইউরোপের পক্ষে একটা প্রলয়, কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হয় কি যে ইউবোপের বিজ্ঞান, গণতন্ত্র, ক্রমপ্রগতি সব মায়া মরীচিকা—ইউরোপের উচিত আবার মধ্যযুগে ফিরিয়া যাওয়া অথবা চীনেব কি তিব্বতেব শিক্ষাদীক্ষাকে অনুকরণ কবিয়া চলা? যাহারা ভাবিয়া দেখিতে চাহে না বা পারে না, বাহিবের দুই একটা অসংলগ্ন ঘটনা হইতেই যাহারা ত্বরিতে একটা সাধাবণ সূত্র কষিয়া ধরিতে চাহে, তাহারাই এমন অপসিদ্ধান্ত করিতে সুপটু।

ভুল ইউরোপও করিয়াছে, আমরাও করিয়াছি; নিজ নিজ আদর্শের অনুসরণে উভয়েরই পদস্খলন হইয়াছে, উভয়েই অস্বাভাবিক অতিমাত্রায় চলিয়া গিয়াছে। তবে ইউরোপ ঠেকিয়া শিখিতে পারিয়াছে, নিজেকে সংশোধন করিয়া লইতে প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু সেই জন্য তাহার বিজ্ঞানকে, গণতন্ত্রকে, ক্রমোন্নতিবাদকে বিসর্জ্জন দিয়া বসে নাই, বরং চাহিতেছে এগুলির অভাব ত্রুটি সারিযা পূর্ণাঙ্গ করিয়া ধরিতে, মহত্তর উদ্দেশ্যে কল্যাণকর পথে তাহাদিগকে চালাইয়া লইতে। প্রাচ্যের

জ্যোতিঃ সে বরণ করিয়া লইতেছে বটে, কিন্তু তাহার নিজস্ব চিন্তার ধারা, জীবনযাত্রার প্রণালীকেই প্রতিষ্ঠা করিয়া তবে নিজেকে খুলিয়া ধরিতেছে অধ্যাত্মের সত্যের অভিমুখে, আপনার বিশিষ্ট জীবনের সত্যকে, সামাজিক আদর্শকে, জ্ঞানবিজ্ঞানকে জলাঞ্জলি সে দেয় নাই। আমাদিগকেও ঠিক তেমনি নিষ্ঠাভবে, তেমনি ভাবে সংস্কারমুক্ত হইয়া ভারতের সনাতন সত্যকে এবং আধুনিক প্রভাব সকলকে কাজে লাগাইতে হইবে। যেখানে যেখানে ভুল হইয়াছে, তাহা সারিয়া লইতে হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিকতাকে আরও বৃহত্তর, উদারতর করিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে; আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা কম নয়, যদি সম্ভব হয়, তবে বেশীই আধ্যাত্মিক হইতে হইবে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে, যুক্তিকে, উন্নতিশীলতাকে, আধুনিক যুগের সকল মূল সত্যকেই আমরা গ্রহণ করিব, কিন্তু আমাদের নিজস্ব জীবনধারার উপর দাঁড়াইয়া, আমাদের অধ্যাত্ম আদর্শ ও লক্ষ্যের সহিত মিলাইয়া ধরিয়া। আমাদের চারিদিকে যে জীবনপ্রবাহ বিপুলস্পন্দনে ছুটিয়া চলিয়াছে, আধুনিক প্রাণে যত ঐহিক প্রেরণা, যত আধিভৌতিক কর্ম্মৈষণা খেলিয়া উঠিতেছে, তাহার মধ্যে আমরা ঝাঁপ দিয়া পড়িতে পারি; কিন্তু সে জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যে মূল উপলব্ধি তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে কেন? দুইটির মধ্যে ত কোন বিসম্বাদ নাই। বরং তাহারা একটি আর-একটির সহায়, পরস্পরের নিভৃত অর্থ রূপায়ণ তাহারা পরস্পরে বিকশিত

করিয়া তুলিতেছে, উভয়ে উভয়কে সমৃদ্ধ, ঐশ্বর্য্যপূর্ণ করিয়া ধরিতেছে।

ভারত তাহার নিজত্বে প্রতিষ্ঠিত হইযা, স্বধর্ম্মকে অনুসরণ করিয়াই নিজে উন্নত হইবে, জগতের সেবায আসিবে। এই কথার অর্থ এমন নয়—সঙ্কীর্ণ মন লইয়া সংস্কারান্ধ হইয়া অনেকে যেমন সিদ্ধান্ত করিযা বসেন—যে কালস্রোতে নূতন যাহা কিছু আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে অথবা ইউরোপ যাহা কিছু সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছে বা সামর্থ্যের সহিত ব্যক্ত করিয়াছে, তৎসমস্তই দূর করিযা ফেলিয়া দিতে হইবে। এ রকম মনের ভাব যুক্তির দিক দিয়া যেমন মূঢ়তার পরিচয়, কাজের দিক দিয়া তেমনি অসম্ভব—শুধু তাই নয়, ইহা আধ্যাত্মিকতার অভাব। কারণ, সত্যকার আধ্যাত্মিকতা কোন নূতন জ্ঞানকেই পরিহার করে না, মানবজাতির আত্মোন্নতির উপায় বা উপকরণ যদি আরও কিছু জুটিযা যায় তবে তাহা ফেলিয়া দেয় না। আমাদের অন্তরাত্মাকে, আমাদের সত্তার বিশিষ্ট ধরণকে, আমাদের সহজাত স্বভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে এবং তাহার সহিত মিলাইয়া মিশাইযা ধরিতে হইবে আমরা যাহা কিছু বাহির হইতে আহরণ করিব আর তাহার ভিতর হইতেই বিকশিত করিয়া ধরিতে হইবে আমরা যাহা কিছু কর্ম্ম করিব, যাহা কিছু সৃষ্টি করিব। ইহাই হইল আমাদের সূত্রটির অর্থ। অধ্যাত্মধর্ম্মই বিশেষভাবে ভারতের মনোযোগ চিরকাল আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে—ইহাই হইল ভারতের অন্তর-পুরুষের কথা।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে অত্যধিক ধর্ম্মালোচনাই ভাবতেব সর্ব্বনাশ করিয়াছে ; সমস্ত জীবনকে যে আমবা ধর্ম্ম বলিয়া মনে কবি অথবা ধর্ম্মকেই আমবা যে মনে কবি সমস্ত জীবন.—ঠিক এই কাবণেই আমবা জীবনযুদ্ধে হটিয়া গিয়াছি, আমবা তলাইয়া গিয়াছি। এই অনুযোগের উত্তরে আমি কবিব ঈষৎ অন্য প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ভাষায বলিতে চাহি না যে আমাদেব অধঃপতনে কিছু আসে যায না, যে ধূলায় পড়িয়া ভাবত গড়াইতেছে তাহাও পবিত্র। পতনে, ব্যর্থতায় অনেকখানিই আসে যায় ; মানুষেব পক্ষে হউক, জাতির পক্ষে হউক ধূলায পডিয়া গডান খুব সম্মান-কব কাজ নয়। কিন্তু আসল কথা, পতনেব কাবণ যাহা নির্দ্দেশ করা হইযাছে তাহা ত নয। ভাবতেব অধিকাংশ লোক যদি সমস্ত জীবনকে সত্য সত্যই ধর্ম্মসর্ব্বস্ব কবিযা তুলিতে পাবিত, তবে আব আমাদেব এমন অবস্থা হইত না। আমাদেব অধঃ-পতন হইযাছে, কারণ সমষ্টিগত জীবনে আমবা হইয়া পডিযা-ছিলাম ভীষণ অধার্ম্মিক, আত্মসর্ব্বস্ব, নাস্তিক, জডবাদী। হইতে পাবে, এক সমযে আমবা একদিকে অত্যধিক ধার্ম্মিকতাব দিকে, অর্থাৎ অত্যধিক পবিমাণে বাহ্যিক অনুষ্ঠান, শাস্ত্র আচাব নিযমের দিকে ঝুঁকিযা পড়িযাছিলাম ; অন্য দিকে আবাব চলিয়া গিযা-ছিলাম সন্ন্যাসের বৈবাগ্যের অতিমাত্রায়—ফলে, যাঁহারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাঁহারাই সমাজ হইতে সবিযা পড়িযাছিলেন, প্রাচীন ঋষিদেব মত তাঁহাবা সমাজেব পিছনে সমাজের অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা-রূপে দাঁড়াইয়া, সমাজেব উপব জ্ঞানেব আলো, জীবনের শক্তি

ঢালিয়া দিতে পাবেন নাই। কিন্তু ভারতের দুববস্থার মূল হেতু হইতেছে, একটা উদার বিস্তৃত অধ্যাত্ম প্রেবণার সঙ্কোচন, মুক্ত ও সতেজ বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস. মহৎ আদর্শের ক্রমিক অভাব, প্রাণশক্তিব ক্ষয়।

এক অর্থে হযত আমাদেব মধ্যে ধার্ম্মিকতাব অত্যধিক প্রাদুর্ভাবই হইয়াছিল। ধার্ম্মিকতা শব্দটি আমরা ইংবাজী 'বিলিজন্' (Religion)-এব পরিবর্ত্তে ব্যবহাব কবিতেছি —'রিলিজন্' কথাটিব ঠিক ভারতীয প্রতিশব্দ কিছু নাই, ইহার সহিত বিশেষ একটা মতবাদ, আচার অনুষ্ঠান, বাহ্যিক সৎকর্ম্ম, পুণ্য আহরণ এই সব জডিত। এই অর্থে ধার্ম্মিকতা ছিল, খুবই। ধার্ম্মিকতা ছিল, কিন্তু ছিল না ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে আমবা বুঝি আধ্যাত্মিক প্রেবণাকে পূর্ণ অখণ্ডভাবে অনুসবণ কবিযা চলা আব আধ্যাত্মিকতা বলিতে বুঝি আমাদের যে সর্ব্বোত্তম আত্মসত্তা, যে ভাগবত সর্ব্বব্যাপী একত্ব তাহাকে জানা, তাহাতে বসবাস করা, জীবনের প্রত্যেক অঙ্গকে তাহাব দিব্যরূপে তুলিযা ধবা। এই ধর্ম্মের প্রাচুর্য্য ত ছিলই না, বরং ছিল যথেষ্ঠ অপ্রতুল, আব যতটুকুও বা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত তাহা ছিল গণ্ডীবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ। ভারতের এই সনাতন আদর্শকে খাট করিয়া ধরিলে রোগের প্রতিকার হইবে না, তাহা সুপ্রাচীনকালে ছিল যেমন তেমনি উদার করিয়া ধরিতে হইবে, আরও বৃহত্তর করিয়া ছড়াইয়া দিতে হইবে, যেন জাতির সমগ্র জীবন সত্য সত্যই এই আধ্যাত্মিক অর্থে মূর্ত্ত ধর্ম্ম

হইয়া দাঁড়ায়। এই দিকেই দেখি ধীরে ধীরে ইউরোপের কাব্য, দর্শন, শিল্পকলা হাতড়াইয়া চলিয়াছে, অন্ধকারে অন্ধকারে চলিলেও তাহার পথে ক্রমশঃই আলো ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার রাষ্ট্রনীতিক সামাজিক আদর্শাদির মধ্যেও নূতন একটা সত্যের প্রভা যেন বিচ্ছুরিত হইতেছে। কিন্তু এই সত্যেব পূর্ণ জ্ঞান, এই আদর্শের সজ্ঞান প্রযোগকৌশল একমাত্র আছে ভারতেব ভাণ্ডারে। তাই ত যে সব তথ্যেব ব্যবহাব এক সময়ে ভাবত কবিতে পারে নাই, তাহা আজ সে নূতন জ্ঞানেব আলোকে সতেজ কবিয়া ধরিতে পাবে, তাহাব পূর্ব্বতন সাধন-ধাবায যাহা কিছু ছিল জীর্ণ, অথর্ব্ব, তৎসমস্ত আজ সে সংস্কাব কবিযা লইতে পারে। তাহার আধ্যাত্মিক আদর্শকে বাহিরেব আক্রমণ হইতে বক্ষা কবিবাব জন্য যে জাঙ্গাল দেউল তুলিযা দিযাছিল, তাহাই পরে তাহাব প্রকাশেব বিস্তৃতিব পথে অন্তবায হইয়া উঠে; আজ সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাব অন্তবাত্মাকে সে দিতে পাবে একটা মুক্তগতি বিশাল লীলাযতন। ভাবত যদি সঙ্কল্প করে, তবে মানবজাতি আজ যে সকল সমস্যা লইযা বিব্রত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের দিতে পারে একটা অব্যর্থ মীমাংসা, একটা নূতন নির্দ্দেশ। সে সব সমস্যা-সমাধানের মূল সূত্র যে রহিয়াছে তাহারই প্রাচীন জ্ঞানের মধ্যে। ভাবতের নবজন্ম আজ ভারতের সম্মুখে এই যতখানি সুযোগ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপেই সে করায়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিবে কি পারিবে না, তাহা জানেন ভারতের ভাগ্যবিধাতা।

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা গ্রন্থ

(মূল ও অনুবাদ)

মূল :

অনুবাদ :